ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ২৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ ঃ ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, **বিপণন বিভাগ** : ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : এম. হক কম্পিউটার্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৫-৭

সম্পাদকীয়

আইনের মর্যাদা ও আইনের শাসন

আইনের মর্যাদা নিহিত আইনের শাসনের মধ্যে। আইন মানুষকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি মর্যাদাবান ও পরিশীলিত করে। মানুষ যখন ব্যক্তি পর্যায়ে থাকে তখনো সে একটা আইন তৈরি করে। সে আইন দিয়ে নিজেকে শাসন করে। যে মানুষ নিজেকে শাসন করে চলেনা তাকে বলা হয় উচ্ছৃংখল। তার জীবনে দেখা দেয় বিশৃংখলা। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তফাত এখানেই। মানুষ স্বভাবকে অতিক্রম করে চলতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। তারা স্বভাবের বশ। একে বলা হয় প্রাকৃতিক আইন। আল্লাহর তৈরি এ আইন সমস্ত প্রাণী জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কারোর একে অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই। 'আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।'

(আলে ইমরান : ৮৩)

কেবল মানুষই এর ব্যতিক্রম। মানুষ প্রাকৃতিক আইনের বাইরে নিজের আইন তৈরি করতে পারে। 'আর মানুষ যা করে তাই পায়।' (আন নজম : ৩৯) মানুষের আইন যদি মানুষ নিজেই মেনে না চলে তাহলে মানুষের নিজের অমর্যাদা তো হবেই আবার এই সংগে সে ক্ষতিগ্রস্তও হবে।

মানুষের কেন এ দুর্মতি হয়? সে কেন নিজেই নিজের আইন ভংগ করে? অবৈধভাবে ক্ষুদ্রতর থেকে বৃহত্তর কোনো স্বার্থ লাভ করা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এই ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর স্বার্থ হয় দুনিয়ার প্রতিপত্তি, খ্যাতি, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন। নিজের যা আছে তার চেয়ে বেশি লাভ করার আকাংখা। ষড়রিপুর বশ হয়ে সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হওয়া। অনেক সময় ব্যক্তিকে ছাপিয়ে সমষ্টিস্বার্থ বিরাট দানবে পরিণত হয়। চারদিক দাপিয়ে ফিরতে থাকে। যা কিছু ভালো আছে তাকে সাবাড় করে। অন্যায়, জিঘাংসা ও দুষ্কৃতির প্রসার তার রীতিতে পরিণত হয়। তখন মানুষ হয়ে যায় অমানুষ। এই আইন ভংগকারীরা সবসময় যে অসৎ প্রবৃত্তির উলংগ প্রকাশ ঘটায় তা নয়। অনেক সময় এরা

নেকী ও সততার ছদ্মাবরণে নিজেদের ঢেকে রাখে। আইনের এই কৃত্রিম সাজসজ্জা বড়ই মোহময়। আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার এই প্রবণতা যাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মহান আল্লাহ্ সেগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। যাতে করে যেসব অপরাধে তারা নিজেদের কলুষিত করতে চায় নিছক সুযোগের অভাবে যেন সেগুলো থেকে বিরত না হয়। বনি ইসরাঈলদের একটা গ্রুপ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম।' (আল আরাফ : ১৬৩) এসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অনুগ্রহধারী লোকদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।'-(আল মুয্যাম্মিল : ১১)

বনি ইসরাঈলের একটি গ্রুপের এ ধরনের অপরাধ প্রবণতার কথা কুরআনে অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র আইনে শনিবার দিনটা তাদের জন্য কেবলমাত্র ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত ছিল। এদিন ব্যবসা বাণিজ্য রান্নাবান্না ইত্যাদি দুনিয়াবী সমস্ত কাজ কারবার তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাদের চালাক গ্রুপটি এটা মেনে নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে আল্লাহর বিধান ভংগ করে তারা শনিবার প্রকাশ্যে দুনিয়ার সব কাজ কারবার শুরু করে দিল। আল্লাহ্ এই অন্যায় কাজ করার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দিলেন। এটিই আল আ্যরাফের ১৬৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– 'তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম।' যেমন শনিবার তাদের জন্য মাছ শিকার করা মানা ছিল। এই সম্প্রদায়ের আবাস ছিল সাগরের ধারেই। আর শনিবার মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে পানির উপরিভাগে ভেসে বেড়াতো। চালাক লোকেরা শনিবার মাছ ধরলো না। কিন্তু সাগরের ধারে পুকুর কেটে তার মধ্যে মাছ প্রবেশের ব্যবস্থা করলো। তারপর প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিল। পরদিন আটকে পড়া মাছগুলো ধরলো। তারা শনিবার মাছ ধরলোনা কিন্তু শনিবার কৌশলে মাছগুলোকে বন্দী করে রবিবার ধরলো। তারা যে অপরাধপ্রবণ সুযোগ পেয়েই তার প্রমাণ দিল। তারা যে আইনের মর্যাদা রক্ষাকারী নয় বরং আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারকারী একথা প্রমাণিত হলো।

আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এমনকি তাদের মানবিক রূপের বিকৃতি সাধনা করেছেন। এ তাদের দুনিয়ার শাস্তি। আর আখেরাতে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি তো আছেই। তারা আইনের মর্যাদা রক্ষা করেনি। কাজেই

আইনও তাদের মর্যাদা রক্ষা করেনি। এটা আজ থেকে সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগের ঘটনা। মানুষের সভ্যতা তখনো অতদূর এগোয়নি। কিন্তু আজকের সুসভ্য এবং সে সময়ের চাইতে অনেক বেশি তথ্যাভিজ্ঞ মানুষও এই ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। আজকের বিশ্বে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে গোপনে ও প্রকাশ্যে যতগুলো অসি ও মসি যুদ্ধ চলছে সবগুলোর মধ্যে রয়েছে এই আইনের নামে আইন ভংগের প্রবণতা। আইনের নামে বেআইনি কাজ কারবার। বিশ্বে মহাশক্তিধরদের মধ্যে যদি আইনের মর্যাদা রক্ষা করার এবং আইনের শির উঁচু রাখার প্রবণতা কাজ করতো তাহলে বিশ্ব অশান্ত হয়ে উঠতো না। দুর্বল প্রবলের থাবায় নিষ্পিষ্ট হতো না।

আমাদের দেশেও একই কথা। ক্ষমতাধররা যদি আইনকে মর্যাদা দান করেন, আইনের নামে বেআইনি কাজ না করেন, আইনকে পাশ কাটিয়ে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপান তাহলে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা থাকে না। তাঁরাও বাঁচেন, দেশের মানুষও বাঁচে। তাদের মর্যাদা বাড়ে, দেশের মর্যাদাও বাড়ে। শাসকদের উচিত বনি ইসরাঈলী প্রতারণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে দেশে প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা।

আবদুল মান্নান তালিব

***** ***** *****

পত্রিকার কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধি

আমাদের বিজ্ঞ ও সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই জানেন ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকাটির মাধ্যমে আমরা ইসলামী আইন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং এ দেশে ইসলামী আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ জন্য পত্রিকাটিকে অবশ্যই আমাদের একটি বিশেষ মানে উন্নীত করতে হবে। এসব দিক বিবেচনা করে পত্রিকার সাইজ ও কলেবর বৃদ্ধি করে আমরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তাতে ১৬০ পৃষ্ঠার এ পত্রিকাটির দাম দুর্মূল্যের বাজারে ১০০ টাকার কম রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

আশা করি আমাদের শুভাকাংখী ও সহৃদয় পাঠকবর্গ বিষয়টিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৯-৩০

ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ*

সারসংক্ষেপ

[ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। ধর্ম হিসেবে ইসলাম, ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কুরআন এবং নবী হিসেবে মুহাম্মাদ স.-এর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইসলাম দাবি করে জীবন-জগতের সব জিজ্ঞাসা ও সব সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে। পবিত্র কুরআন নিজেই ঘোষণা করে সকল কিছুর বিবরণ তাতে রয়েছে। আর মহানবী স.-এর আদর্শ এমন এক সর্বব্যাপী কালজয়ী ও শাশ্বত যে, মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত কখনও যার আবেদন ফুরাবে না। বিশ্ব যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করছে ততই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাহ্যত কুরআন ও মহানবী স-এর সুন্নাহয় আধুনিক এসব বিষয়ের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা বিশ্ব মানব কুরআন ও মহানবী স.-এর সুন্নাহর আলোকে চিন্তা গবেষণা করে নতুন সৃষ্ট জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করতে উদ্দীপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ার নামই ইজতিহাদ। মহানবী স.-এর নবুওয়াতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত ইজতিহাদের কার্যকারিতা ইসলামকে কালজয়ী আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের সামনে এখন প্রশ্ন উঠেছে কৃত্রিম অংগ-প্রত্যংগ সংযোজন, টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম প্রক্রিয়া অথবা মানব ক্লোনসহ আরো অসংখ্য জটিল সমস্যায় ইসলাম সম্মত সমাধান কী হবে তা বিশ্বমুসলিমের ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন মনীষীগণকে ইজতিহাদ তথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করে বলতে হবে। আর এভাবেই ইসলামের গতিময়তা সাবলীলভাবে অব্যাহত থাকবে কিয়ামত অবধি- যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. করেছেন। অতএব, ইজতিহাদ ইসলামের একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ, অতঃপর ইজমা ও কিয়াস। শরীয়তের উৎসসমূহের মধ্যে কিয়াসের স্থান চতুর্থ হলেও ইজতিহাদের প্রধান পন্থা হিসেবে এর প্রভাব-পরিসর অতি প্রশস্ত। কারণ মানব-জীবনের ঘটনাবলী সীমাহীন, অথচ কুরআন-সুন্নাহয় আইনের যে সকল ধারা-

*অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপধারা রয়েছে সে সকল আপন বিস্তৃতির সঙ্গেও সীমাবদ্ধ। অতএব, জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতি যুগে কিয়াস তথা ইজতিহাদের আবশ্যকতা রয়েছে; এর দ্বারা ইসলামী আইন শাস্ত্রে বহু নতুন ধারা-উপধারা সংযোজিত হয়ে আসছে। অন্য কথায় ইজতিহাদ বা কিয়াসকে ইসলামের জীবনী শক্তি বলা যেতে পারে। তাই আমরা অত্র প্রবন্ধে ইজতিহাদ, ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা, ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রকারভেদ, ইজতিহদের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা, মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলী, ইজতিহাদের পদ্ধতি, ইজতিহাদের বিষয়বস্তু, ইজতিহাদে সতর্কতা অবলম্বন, ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ, ইজতিহাদ উন্মুক্ত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা স্থান পাবে।]

ইজতিহাদ অর্থ

ইজতিহাদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে আল-মু'জাম-আল ওয়াসীত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইজতিহাদ-এর শাব্দিক অর্থ– যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা, সাধনা করা। ফিকাহবিদদের পরিভাষায়, শরীয়তের বিধান সম্পর্কে ধারণা জন্মানোর জন্য ফিকাহবিদ কর্তৃক স্বীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করার নাম ইজতিহাদ।[১] আল কামুস-আল-ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে, আত্মাকে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়ে এবং কষ্ট আস্বাদনে বাধ্য করা, শরীয়তী বিধান জানার জন্য স্বীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করা।[২] সহজ করে বলতে গেলে, 'ইজতিহাদ' শব্দের অর্থ- সম্যক ও সমন্বিত সামগ্রিক প্রচেষ্টা। কুরআন ও হাদীস হতে হুকুম-আহকাম ও মাসআলা আহরণ এবং নির্ণয় করার নিমিত্ত বিজ্ঞ আলিমগণের অবিরাম প্রচেষ্টা ও গবেষণামূলক বিচার-বুদ্ধির সাধ্যানুগ প্রয়োগকে শরীয়তের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয়।[৩]

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল করীমে মানুষের জীবন-ব্যবস্থার পক্ষে আবশ্যিক মৌলিক বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতঃপর মুহাম্মাদ মুস্তফা স. আল্লাহর কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং তদনুসারে একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলে তার আদর্শও স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই স্থান বা কালের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তার যতখানি অংশ স্থান ও কালের প্রভাব হতে মুক্ত ততখানি হয় চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়, আর যতখানি স্থান বা কাল-সংশ্লিষ্ট, ততখানিতে স্থান-কালের পরিবর্তনের দরুন শূন্যতা দেখা দিতে পারে বা দেখা দিয়ে থাকে। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইসলামে ইজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে। মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে যুগে যুগে এই শূন্যতা পূরণ করবেন, এটাই হল ইসলামের বিধান। ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামের জীবনীশক্তি। পর্বত হতে পানি নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলে

যেমন নদী মজে যেতে বাধ্য, তেমন ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেলে ইসলামও মরে যেতে বাধ্য।[৪] এ কারণেই শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহলবী র. প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদকে ফরয বলে মন্তব্য করেন এবং এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন–
"আমি যে বলেছি– প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরয তার কারণ এই যে, ঘটনাবলী অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কী তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই ফরয। পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সকল যুগের জন্য যথেষ্ট নয়।[৫] ... যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, একালে মুজতাহিদ পাওয়া যায় না বা যেতে পারে না তারা নিশ্চয় ভুল করেন"।[৬]
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী র. বলেন, শরীয়ত অনুসারে ইজতিহাদ বন্ধ হতে পারে না, কেননা তা ফরযে কিফায়া। কোন যুগে কেউই যদি এর প্রতি মনোযোগী না হন এবং সবাই-ই তা ছেড়ে দেন তা হলে সবাই গোনাহ্গার হবেন। ইমাম মাওয়ার্দী, বাগাবী, ইমাম ইবনুস সালাহ্ ও নববী প্রমুখ ইমামগণও একই কথা বলেছেন ।[৭]
ইসলাম ধর্ম বিশ্বে প্রচলিত সব ধর্মের জন্য মোহর স্বরূপ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যার উদ্ভব হবে সব সমস্যার যিম্মাদার। অতএব কুরআন, সুন্নাহ্ ও এতদসম্পৃক্ত জ্ঞান, এসব কিছুই ঐ প্রবহমান ঝর্ণাধারার অন্তর্ভুক্ত যা থেকে সমস্যা সমাধানের ধারা উৎসারিত হয়। অনন্তর সাহাবা-ই-কিরাম, তাবিঈন ও ইজতিহাদ বিশেষজ্ঞগণের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন এবং যে সব মূলনীতির নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর উপর অপরাপর আহ্কামকে অনুমান করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনাবলীকে শাখা-প্রশাখা ও চলমান ঘটনাবলীর প্রতি আরোপিত করার জন্য ইজতিহাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এভাবে ইজতিহাদ ও কিয়াস আইনতত্ত্বের মূলনীতিতে একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে স্থান পেয়েছে। এতে করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বোধের পরিমণ্ডল পরিব্যাপ্তি লাভ করে। এই পরিমণ্ডলকে সংকীর্ণ করার কিংবা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রবহমান ঝর্নাধারার গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়া মোটেই কাম্য নয়। কেননা কুরআন, সুন্নাহ্ ও বিবেক বুদ্ধির প্রমাণাদি দ্বারা এটা স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, এই পরিমণ্ডল ইসলামের প্রত্যেক যুগেই বিস্তৃতাকারে বিদ্যমান থাকবে।[৮] পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্নগণ। তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৯] অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, "নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"[১০] কুরআনের এ আয়াতে 'ই'তিবার' শব্দ আরবী ব্যবহার করা হয়েছে; কোন জিনিসের নির্দেশনাকে তার অনুরূপ জিনিসের প্রতি আরোপ করার নামই হলো 'ই'তিবার'। এ কারণেই যে মূল জিনিসের প্রতি তার সামঞ্জস্যশীল জিনিসকে আরোপিত করা হয় তাকে 'ই'বরাত' বলে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে, "তারা যদি ব্যাপারটা রসূল স. ও তাদের মধ্যকার বিজ্ঞজনদের প্রতি ন্যস্ত করতো তবে তাদের মধ্যে যারা এটা বোঝার

যোগ্যতা রাখে, তারা নিজেরাই তা জানতো"।[১১] কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ 'ইসতিমবাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লামা সারাখসী র. তার 'উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ইসতিমবাত'-এর অর্থ হচ্ছে ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলীর সঠিক কারণ উদঘাটন করা।[১২]

ইজতিহাদ, কিয়াস ও ই'তিবার সম্পর্কিত মহানবী স. এবং সাহাবাগণের বহু বাণী রয়েছে। ইমাম সারাখসী র. তার *উসূল* গ্রন্থে, ইবনে আব্দুল বার র. তার 'জামেউল বয়ান আল-ইলম' গ্রন্থে, হাফিয ইবনে কাইয়্যিম র. তার 'ইলাম আল-মুয়াক্কিঈন' গ্রন্থে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য 'উলামা-ই-কিরামও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের [মহানবী স. ও সাহাবাগণের] বহু বাণী সংকলন করেছেন। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় কেবলমাত্র মু'আয রা.-এর হাদীসটির উল্লেখই যথেষ্ট যা 'সুনান' গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন আর গোটা মুসলিম জাতি তা অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করেছেন।[১৩]

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী শব্দগত কিছুটা পার্থক্য করে মু'আয রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী স. যখন মু'আয রা.-কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ মুতাবিক। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– যদি আল্লাহর কিতাবে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে? তদুত্তরে তিনি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ সা-এর সুন্নাহ অনুযায়ী। মহানবী স. পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায়? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তবে আমি নিজের বুদ্ধি দ্বারা ইজতিহাদ করবো এবং চিন্তা-গবেষণায় কোন অবহেলা করবো না। এতদশ্রবণে মহানবী স. বললেন, সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার তাওফীক দিয়েছেন।[১৪]

আধুনিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর সব চেয়ে উত্তম প্রমাণ হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা ইমাম নাসাঈ র. তার সুনান গ্রন্থে 'বাব-আল-হুকম বি ইত্তিফাক-আহল আল-ইলম' শীর্ষক অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বিশদ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যাতে উল্লেখ রয়েছে– 'যদি তোমার সম্মুখে এমন কোন ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, যার সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআনে উল্লেখ নেই আর মহানবী স. ও এর কোন সমাধান দিয়ে যাননি, তবে 'সালফে সালেহীন' (পূর্ব যুগের অভিজ্ঞ আলিমগণ) যেভাবে এর সমাধান দিয়েছেন, সেভাবেই তার সমাধান দিতে হবে। যদি এমন কোন ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিদ্যমান নেই, মহানবী স.ও কোন সমাধান দিয়ে যাননি এবং সালফে সালেহীন (পূর্ব যুগের অভিজ্ঞ আলিমগণ)ও এর কোন সমাধান দেননি, তবে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ইজতিহাদ করবে এবং এ কথা বলবে না যে, আমি ভয় করছি।

কেননা হালাল সুস্পষ্ট আর হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুটোর মধ্যস্থলে কিছু সংশয়ের উদ্রেককারী জিনিস রয়েছে। এজন্য যা কিছু সংশয়ের উদ্রেক করে, তা ছেড়ে দিয়ে যা কিছু সংশয়ের উদ্রেক করে না, তা ধারণ করো।'[১৫]

ইমাম নাসাঈ র. বলেন, এ হাদীসটি অতি উত্তম। আর এ ধরনের হাদীস উমর রা. হতেও বর্ণিত আছে।[১৬]

যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করলে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইমাম সারাখসী র. বলেন, এমন কোন ব্যাপার নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বৈধ কিংবা অবৈধ, প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয়তার নির্দেশ হয়নি। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। কেননা কুরআন-হাদীসের মূল পাঠ সীমিত ও এক পর্যায়ে এসে শেষ হতে বাধ্য। আর চলমান ঘটনাপঞ্জি কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হতেই থাকবে। আর চলমান ঘটনাপঞ্জিকে বর্ণিত হাদীসে 'হাদীসা' (নূতন বিষয়) বলার মাধ্যমে এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, এসব ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে না।[১৭]

মোটকথা, জগতের ঘটনাবলী সদা চলতে থাকবে এবং অনেক নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হতে থাকবে। অতএব এসব সংঘটিত ঘটনাবলীকে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা-ই-উম্মাত ও ঈমানদারদের উত্তরাধিকারী তথা ফিকাহ-এর আলোকে সমাধান করা আমাদের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। এতে কোন প্রকার ভ্রষ্ট নীতি, অক্ষমতা ও হীনমন্যতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

ইসলামী শরীয়তের ইতিহাস, ফিকাহ যুগের পূর্ণতা এবং প্রত্যেক যুগে নব নব সমস্যার উপর গ্রন্থ প্রণয়ন একথারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, যেসব সমস্যার সমাধানে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার সদা উন্মুক্ত। এজন্যই মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে এ মূলনীতির উপর আমল করে আসছে। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছেন এবং এ বুদ্ধিমত্তাকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত বহন করার বাহন বানিয়ে দিয়েছেন এবং এটা দ্বারা চিন্তা-গবেষণা করার ও জ্ঞানগত এবং শিক্ষাপ্রদ জিনিসের মধ্যে এর প্রয়োগের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদুবী র. তার 'উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তা মানবদেহে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যেমনিভাবে বিশ্বজগতে সূর্য একটা আলোক-বর্তিকা। ওটা দ্বারা ভ্রমণ-পথ আলোকিত হয়, যেখানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের পদচারণা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ বুদ্ধিমত্তা নিজে নিজের পথ-প্রদর্শক নয় বরং তার কাজ হলো পথটা আলোকময় করা। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর অন্তরই স্বীয় বোধ-শক্তির আলোকবর্তিকা দ্বারা এর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়। যেমন

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পথ আলোকময় হয়ে যায়, কিন্তু পথ দেখার জন্য কেবল সূর্যালোকই যথেষ্ট নয় বরং চক্ষুজ্যোতিরও প্রয়োজন রয়েছে।[১৮]

সারকথা, বুদ্ধিমত্তা এমন একটি আলো যা দ্বারা অন্তরের ধারণার সকল তমাসা বিদূরিত হয়ে যায়, এমন আলো যা দ্বারা শরীয়তের আহকাম তথা বিধি-নিষেধের পটভূমিকা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

১. 'নিঃসন্দেহে এতে চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য নিদর্শনাদি রয়েছে।' (আল কুরআন, ১৩: ৪)
২. 'তাদের অন্তর থাকলে তদ্দ্বারা তারা বুঝতে পারতো।' (আল কুরআন, ২২ : ৪৬)
৩. 'এমনিভাবে আমার নিদর্শনাদি বিশদাকারে বর্ণনা করি ঐ সব লোকদের জন্য যারা বুঝতে পারে।' (আল কুরআন, ৩০ : ২৮)
৪. 'তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা কিছুই বুঝতে পারে না।' (আল কুরআন, ২ : ১৭১)
৫. 'এবং অপবিত্রতা বা আবর্জনাকে ঐ সব লোকের উপর ঢেলে দেই যারা চিন্তাভাবনা করে না।' (আল কুরআন, ১০ : ১০০)
৬. 'একমাত্র বোধসম্পন্ন লোকেরাই তা বুঝতে পারে।' (আল কুরআন, ২৯ : ৪৩)
৭. 'তারা কি কুরআনকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না কি তাদের অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ রয়েছে?' (আল কুরআন, ৪৭ : ২৪)
৮. 'কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন লোকরাই বুঝতে পারে।' (আল কুরআন, ১৩ : ১৯)
৯. 'সম্ভবত তারা চিন্তা করবে বা ভয় করবে।' (আল কুরআন, ২০ : ৪৪)
১০. 'কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ধাবমান অন্তরই চিন্তা ভাবনা করতে পারে।' (আল কুরআন, ৪০ : ১৩)
১১. 'জ্ঞানীদের এটা বুঝা উচিত।' (আল কুরআন, ৩৮ : ২৯)
১২. 'আর আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তারা চিন্তাভাবনা করতে পারে।' (আল কুরআন, ১৪ : ২৫)

এভাবে মহানবী স.-এর অনেক হাদীস রয়েছে যাতে চিন্তা-গবেষণার প্রতি উম্মতকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

একথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল অতিক্রম করে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যেখানে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পদচারণা সমাপ্ত, সেখানে বুদ্ধিমত্তার চেয়েও উচ্চতর

একটা পরিমণ্ডল রয়েছে। আর তা হলো মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াহী ও নবুওয়াতের পর্যায়। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ওয়াহীর নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনে জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং জ্ঞানের গর্ব করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তা ওয়াহী ও নবুওয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিষয়াদি বুঝতে পারে আর নিজের আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা ওয়াহীর মাহাত্ম্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তার উচ্চ কলা-কৌশল, গভীর সমন্বয় ও সূক্ষ্ম প্রেক্ষিতগুলো অনুধাবন করতে পারে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কিতাব, সুন্নাহ তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়ত বা জীবন-বিধান ও স্পষ্ট বিধিবিধানের সামনে মস্তক অবনত করা, সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যতিরেকে জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য কোন গত্যন্তর নেই। আর যদি তা ওয়াহীর নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয় তবে তার সামনে নিজের অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করতে হবে। সারকথা এই যে, ওয়াহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-বুদ্ধিকে সবচাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া ত্রুটিপূর্ণ ও মন্দ পন্থা অবলম্বন বৈ আর কিছু নয়। আবার ওয়াহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকা অবস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারস্থ না হওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা ও অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। এতদুভয়ের মধ্যম নীতি অবলম্বন করাই হলো প্রকৃত কথা, আর এটাই হলো 'সিরাতুম মুসতাকিম' বা সরল পথ।[১১]

ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রকারভেদ

ইজতিহাদ প্রধানত দুই প্রকার : 'ইজতিহাদে মুতলাক' ও 'ইজতিহাদে মুকাইয়াদ'। কোন বিশেষ মাযহাব বা বিশেষ ব্যক্তির নীতি অবলম্বন ব্যতীত যে ইজতিহাদ করা হয়, তাকে 'ইজতিহাদে মুতলাক' বলে এবং এরূপ ইজতিহাদের অধিকারীকে 'মুজতাহিদে মুতলাক' বলে। কোন বিশেষ মাযহাব বা ব্যক্তির নীতি অবলম্বনে যে ইজতিহাদ করা হয়, তাকে 'ইজতিহাদে মুকাইয়াদ' এবং এরূপ ইজতিহাদের অধিকারীকে 'মুজতাহিদে মুকাইয়াদ' বলে।

'মুজতাহিদে মুতলাক' আবার দুই প্রকার : 'মুজতাহিদে মুস্তাকিল' ও 'মুজতাহিদে মুন্তাসিব'। মুজতাহিদে মুস্তাকিল : যিনি কারো সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং ইজতিহাদ করতে ও ইজতিহাদের উসূল বা নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করতে সক্ষম। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এই শ্রেণীর মুজতাহিদ। মুজতাহিদে মুন্তাসিব : যিনি প্রথম শ্রেণীর মুজাহিদগণের গুণাবলীর অধিকারী হয়েও কোন প্রথম শ্রেণীর মুজাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তার উসূলের অধীনে ইজতিহাদ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার, ইমাম মুযানী, ইমাম ইবনে ওয়াহাব ও ইমাম ইবনে কাসেম এই শ্রেণীর মুজতাহিদ। প্রথমোক্ত তিনজন ইমাম আবূ হানীফার, মুযানী ইমাম শাফেঈর এবং

শেষোক্ত দুইজন ইমাম মালেকের উসূলের অধীনেই ইজতিহাদ করেছেন, যদিও তারা ছোটখাট অনেক ব্যাপারে তাদের মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

এভাবে মুজতাহিদে মুকাইয়াদও দুই প্রকার। 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' ও 'মুজতাহিদ ফিল ফাতাওয়া'। মুজতাহিদ ফিল মাযহাব : যিনি প্রথম এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুজতাহিদের গুণাবলীরও অধিকারী নন, কিন্তু আপন মাযহাবের নিয়ম (উসূল) অনুসারে ইজতিহাদ করতে সক্ষম। শামসুল আয়িম্মা হালওয়ায়ী ও ইমাম সারাখসী এই শ্রেণীর মুজতাহিদ। তারা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব অনুসারে ইজতিহাদ করতে সক্ষম ছিলেন। এরূপ ইজতিহাদের অপর নাম তাহকীকে-মানাত। মুজতাহিদ ফিল-ফাতাওয়া : যিনি আপন ইমামের মাযহাবে বর্ণিত বিভিন্ন ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্তের মধ্যে উত্তম-অধমের পার্থক্য করতে সক্ষম। [২০]

ইজতিহাদের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা

রসূলুল্লাহ স.-এর যামানাতেই ইজতিহাদের সূত্রপাত হয়। রসূলুল্লাহ স. শাসক ও বিচারকদেরকে ইজতিহাদের অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। মুআ'য ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে শাসকরূপে নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় ইজতিহাদের অনুমতি দান করেন। তবে, রসূলুল্লাহর জীবনে ওয়াহীর ধারা বিদ্যমান থাকার কারণে ইজতিহাদের আবশ্যকতা খুব কমই দেখা দিয়েছিল।

রসূলুল্লাহ স.-এর পরে সাহাবীগণের যুগে একদিকে ওয়াহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার, অপরদিকে নতুন নতুন সমস্যাবলী দেখা দেয়ার কারণে ইজতিহাদের আবশ্যকতা তীব্র হয়ে ওঠে, ফলে সাহাবীগণের মধ্যে যারা ইজতিহাদের অধিকারী ছিলেন তারা সবাই আপন আপন শক্তি অনুযায়ী ইজতিহাদ করেন। প্রায় দেড়শত সাহাবী ইজতিহাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা সমধিক প্রতিভাবান ছিলেন তাঁরা হলেন উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, যায়দ ইবনে সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.।

এভাবে সাহাবীগণের পর তাবেয়ীগণও, যখনই তাদের নিকট এমন কোন নতুন প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে যার উত্তর কুরআন, হাদীস কিংবা সাহাবীগণের ফাতওয়ায় সরাসরি নাই-তখনই তারা কুরআন ও হাদীসের সূত্র এবং সাহাবীগণের ফাতওয়াকে সম্মুখে রেখে ইজতিহাদ করেছেন। তাবেয়ীদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হলেন : সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (৯৪ হি.), মুজাহিদ ইবনে জাবার (১০৭ হি.), আতা ইবনে আবি রাবাহ (১০৫ হি.), ইব্রাহীম নাখয়ী (৯৫ হি.), ইমাম শা'বী (১০৪ হি.). হাসান বাসরী (১১০ হি.) তাউস ইবনে কায়সান (১০৬ হি.), মাকহূল শা'বী (১১৩ হি.) ও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (১০৬ হি.), ইবনে শিহাব যুহ্রী (১২৫ হি.), কাযী ইয়াহইয়া ইবনে দাউদ (১১৪ হি.), রাবীআহ ইবনে আব্দুর রহমান

ওরফে রবীয়াতুর রায় (১৩৬ হি.) ও হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান (১২০ হি.)। ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের শাগরিদ এবং ইমাম আযম আবূ হানীফার ফিকহের উস্তাদ।[২১]

এরূপে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তাবে-তাবেয়ীন ও তাদের শাগরিদগণও ইজতিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। এ যুগের মুজতাহিদগণের মধ্যে যারা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন তারা হলেন : ইমাম আযম আবূ হানীফা (১৫০ হি.) 'ইমাম মালেক (১৭৯ হি.), ইমাম শাফিঈ (২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (২৪০ হি.), ইমাম আওযায়ী (১৫৭ হি.), ইমাম লাইস ইবনে সা'দ মিসরী (১৭৫ হি.), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (১৫১ হি.), ইমাম আবু সাওর বাগদাদী (১৪০ হি), ইমাম দাউদ জাহেরী (২৭৫ হি.) ও ইমাম আবূ জাফার তাবারী (৩১০ হি.)। তারা সবাই স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত চারজন ব্যতীত কারো ইজতিহাদ মুসলিম-জাহানে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি।

চতুর্থ শতাব্দী হতে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের গতিধারা এক রকম বন্ধ হয়েই যায়। যারা ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করতে পারতেন তারাও নানা কারণে কোন না কোন ইমামের উসূলের অনুসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। আর এই অবস্থা নবম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এই ধরনের মুজতাহিদগণের মধ্যে ইমাম মালেকের অনুসারী ইমাম ইবনে আব্দুল বার (৩৮০ হি.) ও ইমাম ইবনুল আরাবী (৫৫৩ হি.), ইমাম শাফিঈর অনুসারী আবু ইসহাক ফিরোযাবাদী (৫৭৬ হি.), ইবনুস সাব্বাগ (৪৭৭ হি.), ইমামুল হারামান (৪৭৮ হি.) ও ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসারী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) ও ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২২]

নবম শতাব্দীর পর ইমাম আযম আবু হানীফার অনুসারী শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহ্‌লবী (১১৭৬ হি.) ব্যতীত আর কাউকেও এই ধারায় ইজতিহাদ করতে দেখা যায়নি। অবশ্য এ সময়ে সব মাযহাবেই 'মুজতাহিদ' সৃষ্টি হয়েছে এবং ইজতিহাদের কাজ চলেছে ও চলছে।

ইজতিহাদের গতিধারা সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফার মাযহাবে তৃতীয় শতাব্দীর পর আর কোন 'মুজতাহিদ মুন্তাসিবে'র' সৃষ্টি হয়নি। ইমাম মালেকের মাযহাবে এরূপ ব্যক্তি খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। যথা- ইমাম ইবনে আব্দুল বার (৩৮০ হি.) ও ইমাম ইবনুল আরাবী (৫৫৩ হি.)। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের অনুসারী কম হলেও তার মাযহাবে হিজরী নবম শতাব্দী (১৫শ খ্রী.) পর্যন্ত বরাবরই মুজতাহিদ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ইমাম শাফিঈর মাযহাবেই সর্বাধিক মুজতাহিদ সৃষ্টি হয়। [২৩]

ইবনে জুরাইয (৩০৬ হি.)-এর পূর্ব পর্যন্ত কেউই সকল কথায় ইমাম শাফিঈর মতের অনুসরণ করেননি। ইবনে জুরাইয এসেই তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথমে 'তাকলীদ'[২৪] বা অনুকরণের নিয়মাবলী নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তী লোকদেরকে এই পথে চলার উপদেশ দেন।[২৫]

মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলী

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার হুকুম-আহকাম ও আইন কানুন ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীগত উপায়ে সাজানো ও সুবিন্যস্ত নয়। সমুদয় আইন-কানুন কুরআন ও হাদীসের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে কুরআন ও হাদীস হতে হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বেশ সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভবও বটে। এমতাবস্থায় ইসলাম দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে বলে অনেকের ধারণা হতে পারে। তদুপরি স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও হাদীসের বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা ও পরস্পর সম্পর্কের বর্ণনা এবং সামঞ্জস্য বিধান সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এজন্যই বহু সাহাবী ও পরবর্তী যুগে বহু মনীষী-ফিকাহবিদ কুরআন ও হাদীসের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। যে সব ফিকাহবিদ কুরআন ও হাদীসে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন, কুরআনের আয়াতের শানে নুযুল, তাৎপর্য, হাদীসের ব্যাখ্যা-পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, বিবিধ আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম এবং গবেষণামূলক মাসআলা রচনায় ও নীতি-নির্ধারণে পারঙ্গম, তারাই মুজতাহিদ বা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি।[২৬]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী তার বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় *আল ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ* ও *ইকদুল জীদ ফী আহকাম আল ইজতিহাদ ওয়া আল-তাকলীদ*-এ মুজতাহিদের যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন– যার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল–

১. মুসলিম হওয়া। প্রথমত মুজতাহিদকে মুসলিম হতে হবে। কেননা অমুসলিম কর্তৃক ইসলামী আইনের গবেষণা ত্রুটি মুক্ত হবে না এবং তা মুসলিমের উপর প্রযোজ্য নয়।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

৩. স্বাধীন হওয়া।

৪. ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

৫. শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া।

৬. আরবী ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকতে হবে; কারণ কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যথা– নাহু, সরফ, বালাগাত, আরবী বাগধারা, প্রবাদ প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে ইজতিহাদ করা সম্ভব হবে না। কাজেই অনূদিত কুরআন-হাদীস পাঠ করে ইজতিহাদ করতে গেলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

৭. পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা কুরআন হচ্ছে শরীয়তের মূল উৎস। যে ব্যক্তির কুরআনে ব্যুৎপত্তি নেই তার পক্ষে ইজতিহাদের চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং মুজতাহিদের পক্ষে কুরআন-এর আয়াতসমূহের শানে নুযুল, কোন্‌টি নাসিখ, কোন্‌টি মানসূখ, কোন্‌টি মুজমাল, কোন্‌টি মুফাসসির, কোন্‌টি 'আম, কোন্‌টি খাস এবং কোন্‌টি মুহকাম, কোন্‌টি মুতাশাবিহ এ সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী। এছাড়াও শরীয়তের আহকাম যথা–মাকরূহ, হারাম, মুবাহ, মুস্তাহাব, ওয়াজিব ও ফরয প্রভৃতির পারস্পরিক পার্থক্য এবং এর কোন্‌টি কোন্ জাতীয় আয়াত হতে প্রমাণিত হয় তার সম্যক জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়।

৮. সুন্নাহ বা হাদীসের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ হাদীসের নাসিখ ও মানসূখ, মুজমাল ও মুফাসসির, 'আম ও খাস, মুহাকাম ও মুতাশাবিহ এবং শরীয়তের আহকামের কোন্‌টি কোন জাতীয় হাদীস হতে প্রমাণিত তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। হাদীসসমূহের মধ্যে কোনটি সহীহ, কোন্‌টি যয়ীফ, কোন্‌টি মুসনাদ, কোন্‌টি মুরসাল, কোন্‌টি মুতাওয়াতির, কোন্‌টি খবরে ওয়াহিদ, এক কথায় হাদীসের সনদ, বর্ণনাকারী ও মতন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে যদি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় তবে তা সমাধানের বা সমন্বয়ের উপায় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. ইজমায়ে উম্মাতের জ্ঞান অর্থাৎ শরীয়তের কোন্ কোন্ আহকাম সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীন বা পরবর্তী ফকীহগণের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে তার জ্ঞান। অন্যথায় তার পক্ষে কোন বিষয়ে ইজমা বিরোধী মত প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. কিয়াসের জ্ঞান। অর্থাৎ কিয়াসের রুকন, শর্তাবলী এবং কিয়াস করার নিয়ম পদ্ধতির পূর্ণ জ্ঞান।

১১. সাহাবী, তাবিয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণের সে সব বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে যাতে তারা কোন্ কোন্ মাসআলার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করতেন আর কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন।

১২. লোকের আদত-অভ্যাস বা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা– অন্য কথায় স্থান ও কালের প্রভেদ এবং মানবজীবনের বাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া।
১৩. ইসলামী শরীয়তের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া।
১৪. নিয়তকে পরিষ্কার করা, অন্য কথায় ইজতিহাদকারীর মন ও মস্তিষ্ককে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত করা অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে আপন প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীস হতে যা প্রমাণিত হয় তার সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তিকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা।
১৫. কবীরা গোনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা এবং কোন সগীরা গোনাহ বারংবার না করা, অর্থাৎ চরিত্রগতভাবে ভালো লোকদের আস্থাভাজন হওয়া।

যার মধ্যে এ সকল গুণের কোন একটিরও অভাব রয়েছে তার ইজতিহাদ করার কোন অধিকার নেই। তার পক্ষে অন্য কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা অপরিহার্য, যদিও তার কোন বিশেষ মাযহাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকে।[২৭]

ইজতিহাদের পদ্ধতি

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজতিহাদ করার পন্থা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তারা সাধারনত দু'টি পন্থায় ইজতিহাদ করতেন : (ক) কিয়াস ও (খ) ইস্তিসলাহ।

ক. **কিয়াস** : সাহাবীগণের মধ্যে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও যায়েদ ইবনে সাবেত রা. প্রমুখ এই পন্থায়ই ইজতিহাদ করতেন। পরবর্তীকালে ইমাম আযম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইরাকী ফকীহগণ এই পন্থায়ই অনুসরণ করেন।

খ. **ইস্তিসলাহ** : যে বিষয়ে শরীয়তের কোন পূর্বনির্দেশ নেই, সে জাতীয় বিষয়ে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও সাধারণের স্বার্থকে সম্মুখে রেখে ব্যবস্থা অবলম্বন করার নাম 'ইস্তিসলাহ'। এর অপর নাম 'মাসালিহ মুরসালাহ'। এটি কিয়াসের পরিপন্থী নয়। সাহাবীগণের মধ্যে উমর ও তার পুত্র আব্দুল্লাহ রা. এই পন্থায়ই ইজতিহাদ করতেন। মদীনায় তাবেয়ী ফকীহগণও তদ্রূপ করতেন। অতঃপর ইমাম মালেক র. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পন্থাই অনুসরণ করেছেন কিন্তু উমর রা. দেশের সমস্ত কাযীকে কিয়াসের অনুসরণ করতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেননা তা হল নিরাপদ পন্থা। এতে সব সময়ই কিতাব ও সুন্নাহর সহিত সংশ্রব বজায় থাকে, তিনি কূফার শাসক আবু মূসা আশ'আরীকে লিখেছিলেন: যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশ নেই সেরূপ ব্যাপারে যখন তোমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন তুমি ব্যাপারটির রকম ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করবে এবং এর নযীর বা তুলনীয় ব্যাপার কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করবে; অতঃপর সে

সব নযীরকে সম্মুখে রেখে তার হুকুম দিবে (অর্থাৎ কিয়াস করবে) এবং সব সময় আল্লাহর নিকট কোন্‌টি পছন্দনীয়, তা অনুধাবন করতে চেষ্টা করবে।[২৮]

ইজতিহাদের বিষয়বস্তু

মানুষ যে সকল বিশ্বাস বা কার্য করে থাকে তা প্রধানত দুই প্রকার–

ক. যার সম্বন্ধ মানুষ ও তার স্রষ্টার সাথে, শরীয়তের পরিভাষায় এর নাম ইবাদত। ইবাদতে আবার দুটি অংশ (১) আকীদাহ্ বা বিশ্বাসগত অংশ এবং (২) আমল বা কার্যগত অংশ।

খ. যার সম্পর্ক মানুষ ও মানুষের সাথে। শরীয়তে এর নাম 'মু'আমালাত'। মু'আমালাতের আবার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যথা, নৈতিক বিভাগ, আর্থিক বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ ইত্যাদি।

ইবাদত বিশেষ করে এর বিশ্বাসগত অংশ মানুষের আমল বা বুদ্ধির নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এখানে ওয়াহী ব্যতীত কেবল বুদ্ধির পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ করা এক রূপ অসম্ভব। এখানে ইজতিহাদের কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে 'মু'আমালাত' যেহেতু মানব বুদ্ধির বাইরে নয়, এ কারণে কুরআন ও হাদীস এখানে মৌলিক বিধিসমূহ (উসূল) এবং কোন কোন বিষয়ে নযীর স্বরূপ কিছু উপবিধি বর্ণনা করে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় মানব বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ইজতিহাদের ক্ষেত্র এখানে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত।

কুরআন-হাদীস যেখানে নীরব, কেবল সেখানেই মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে। কুরআন ও হাদীস যেখানে কোন হুকুম দিয়েছে সেখানে ইজতিহাদ দ্বারা তার রদবদল করার অধিকার কারো নেই। আল্লামা শামী বলেছেন, ইসলামী বিধি-বিধান দুই প্রকার : (ক) যা কিতাব ও সুন্নাহ্ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তা প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ইজতিহাদ দ্বারা এর রদবদল হতে পারে না। (খ) যা কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এর অধিকাংশ বিষয়েই মুজতাহিদ তার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এমন কি তিনি যদি পরবর্তী যুগে থাকতেন তা হলে তিনি নিজেই এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় রদবদল করতেন। এ জন্যই ওলামায়ে কিরাম এও শর্ত করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের পক্ষেই নিজ নিজ যুগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কেননা যামানার পরিবর্তনের দরুন অনেক আহকামেরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। অতএব পরবর্তী অবস্থাতেও যদি পূর্ববর্তী আহকাম বহাল থাকে, তা হলে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে, শরীয়তের অনুসরণ সহজ করার যে নীতি রয়েছে তার এবং দুনিয়াকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার যে উসূল রয়েছে তার

বিপরীত হবে। এ কারণেই অনেক মুজতাহিদকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। তারা মনে করেন যে, পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ যদি এ যুগে জীবিত থাকতেন, তারা পূর্বসিদ্ধান্তের বিপরীতে আমাদের মতেই মত দিতেন। [২৯]

ইজতিহাদে সতর্কতা অবলম্বন

সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইজতিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. জাবির ইবনে যায়দকে বললেন, "তুমি বসরার ফকীহগণের অন্তর্গত, সুতরাং কুরআন ও হাদীস ছাড়া অপর কিছুর সাহায্যে ফাতওয়া দিবে না। যদি অন্যথা কর তা হলে তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে।" ইমাম শা'বী র. বলেন, "আলিমগণ যদি প্রমাণ হিসেবে তোমাদের নিকট কোন হাদীস উপস্থিত করেন তা হলে তা গ্রহণ করবে; আর যদি তারা ব্যক্তিগত রায় অনুসারে কোন কথা বলেন, তা হলে তা আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিবে।" একবার তার নিকট কেউ জিজ্ঞেস করল, "যখন আপনাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় তখন আপনারা কী করেন?" উত্তরে তিনি বললেন : "জানা লোকের নিকটই তুমি কথাটা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের নিকট কোন মাসআলা থাকলে আমরা তা অন্যের নিকট পাঠিয়ে দেই। তিনি আবার তা অন্য কারো নিকট পাঠিয়ে দেন; এমনকি অবশেষে তা প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে আসে।"

ইমাম আযম আবু হানীফা ইজতিহাদ বিষয়ে সতর্কতার এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি একা তাতে হস্তক্ষেপ না করে নানা বিষয়ের ৪০ জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এক 'মুজতাহিদ মজলিস' গঠন করেন। এতে যিনি যে বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ে তার মতেরই প্রাধান্য দেয়া হতো এবং কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতিতেও কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো না। অবশ্যই তা সতর্কতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইমাম শাফেঈ র. সতর্কতার এই পন্থা অনুসরণ না করলেও তিনি তার সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ বিবেচনা করেছেন। তিনি প্রথম জীবনে বাগদাদে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পুনঃ পুনঃ বিবেচনার ফলে শেষ জীবনে মিসরে তার অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। অনেক ব্যাপারে তার 'কাওলে কাদীম' ও 'কাওলে জাদীদ' বা 'পুরাতন মত' ও 'নতুন মত' নামে দুটি মত রয়েছে। মোটকথা, পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের ব্যাপারে সতর্কতার কোন ঘাটতি রাখেননি।[৩০]

অতএব ইজতিহাদ করতে হলে ইসলামের মৌল নীতিমালার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিষয়ের প্রতি যত্নবান হয়ে যুগ ও পরিবেশকে সামনে

রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সফলতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া এবং বিফলতার জন্য নিজের অক্ষমতাকে দায়ী করতে হবে।

ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ

ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ কী সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবীর মতে ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ দু'টি। প্রথমটি হল– ইমামগণের প্রতি অনুরাগ, আর দ্বিতীয়টি হল– তাকলীদ শুরু হওয়া।

ক. ইমামগণের প্রতি অনুরাগ : ইমামগণের অসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় গুণাবলীর দরুন ও তৎকালীন প্রতিভাবান মনীষীগণ তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদের পন্থা ত্যাগ করে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম যুফার প্রমুখ মনীষীগণ স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদের ক্ষমতা রেখেও ইমাম আযম আবু হানীফার অনুসরণ করাকে গৌরব মনে করেন।

খ. দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আইনশাস্ত্র (ফিকাহ) পৃথকভাবে বিধিবদ্ধ না থাকায় প্রত্যেক বিচারকেরই নতুন বিষয় সরাসরি কুরআন-হাদীস হতে ইজতিহাদ করে বিচার করতে হতো। এতে অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট ঘটতো এবং বিচারকগণ নানাবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হতেন। ইমামগণ কর্তৃক আইনশাস্ত্র বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বিচারকগণ ইমামগণের বরাত দিয়ে বিচার করার মধ্যেই নিজেদের নিরাপত্তা বোধ করতে থাকেন। ফলে, ইজতিহাদের ধারা ক্রমে রুদ্ধ হয়ে আসে এবং 'তাকলীদ" তার স্থান অধিকার করে।[৩১]

২. আল্লামা ড. ইকবালের মতে ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো- (ক) ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ যথা মুতাযিলাদের উদ্ভব (খ) সুফীবাদের প্রভাব এবং (গ) হিজরী ৭ম শতাব্দীতে বাগদাদের পতন ইত্যাদি।

ক. মু'তাযিলাদের বিশৃংখলা ও ধর্মীয় কলহ যখন চরমে পৌঁছে তখন ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইজতিহাদের নামে ভ্রান্ত লোকদের নব নব বিভ্রান্তিকর মতবাদ সৃষ্টি প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে ইজতিহাদ হতে বিরত থাকাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

খ. তাসাউফ বা সূফীবাদের প্রভাবে মুসলমানদের অন্তর হতে প্রকৃত সামাজিকরূপের ধারণা ক্রমে যখন তিরোহিত হয়ে যায় তখন মুসলিম সমাজ তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

গ. হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে বাগদাদের পতন সমগ্র মুসলিম জাহানে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে; এ সময় মুসলমানদেরকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখার জন্য পূর্ববর্তীদের অনুকরণকে কল্যাণকর বলে মনে করা হয়।[৩২]

আল্লামা ড. ইকবাল তার 'রমুজে বেখুদী' গ্রন্থে আরো বলেছেন, "যখন জাতির জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন জাতি 'তাকলীদ' বা অনুকরণ দ্বারাই স্থিতিশীলতা লাভ করে। পূর্ববর্তী বাপ-দাদার পন্থার অনুসরণ কর; এটাই হল জামাতবন্দী বা সংগঠন– আর তাকলীদের অর্থ হল জাতির সংগঠন। পতনের যুগে ইজতিহাদ জাতির সংগঠনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সংকীর্ণ-দৃষ্টি জ্ঞানীদের ইজতিহাদ অপেক্ষা পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণই জাতির রক্ষাকবচ।"[৩৩]

৩. আধুনিক গবেষক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর মতে উল্লেখিত কারণ ছাড়া ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার আরো দু'টি কারণ আছে। আর তা হলো (ক) অগ্রিম সমাধান (খ) অবস্থার স্থিতিশীলতা।

ক. অগ্রিম সমাধানও ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার একটা বিশেষ কারণ। ইমাম আযম আবূ হানীফার পূর্ব পর্যন্ত যখন কোন ঘটনা ঘটত, কেবল তখনই তার সমাধানের চেষ্টা হতো। কোন সমস্যাকে কল্পনা করে এর সমাধানের চেষ্টা করাকে তখন ওলামায়ে কেরাম দস্তুর মত না পছন্দই করতেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা এর ব্যতিক্রম করলেন। তিনি "যদি এরূপ কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, তা হলে সমাধান এরূপ হবে" কল্পনা করে বহু হাজার সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। অতঃপর যখন ঘটনা ঘটল তখন এর জন্য আর নতুন করে ইজতিহাদ করার আবশ্যক হল না। ফলে ধীরে ধীরে ইমাম সাহেবের অনুসারীদের মধ্যে ইজতিহাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতেই হানাফী মাযহাবে ইজতিহাদের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এটা একটা বড় কারণ।

খ. ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার আর একটা বড় কারণ হল অবস্থার স্থিতিশীলতা। নবী করীম স.-এর যামানায় যে সকল সমস্যা বিদ্যমান ছিল স্বয়ং ওয়াহীই সে সবের সমাধান দিয়েছে। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দিগ্বিজয়ের দরুন যে সকল নতুন সমস্যা দেখা দেয় তারা তার সমাধান করেছেন। খিলাফতে রাশেদার পর রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুন যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ তার সমাধানের চেষ্টা করেন। অতঃপর এই সেদিন পর্যন্ত (তুর্কী খিলাফতের অবসান পর্যন্ত) মুসলিম জাহানের সিয়াসত ছিল অপরিবর্তিত। এইরূপে এ যুগের শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল স্থিতিশীল। মোটকথা, নতুন সমস্যার স্বল্পতাই হল এই দীর্ঘ যুগে ইজতিহাদের স্বল্পতার অপর একটি বড় কারণ।[৩৪]

৪. বাংলাদেশের আধুনিক গবেষক-ফিকাহবিদ অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদিরের মতে ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ হল–

ক. প্রাচীন ফকীহগণ ইজতিহাদের সম্পূর্ণ কাজই সমাধা করে গেছেন– নবীনদের জন্য করার কিছু অবশিষ্ট রেখে যাননি। নবীনরা প্রাচীনদের কথা নকল করে দিলেই কাজ চলে যেতে পারে– এ ধারণা ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

খ. নবীনদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির অভাব।

গ. নবীনদের থেকে মহানবী স.-এর যুগ দূরবর্তী হয়ে পড়ায় এবং বিজাতীয়দের প্রভাব তাদের উপর কোন না কোনভাবে পতিত হওয়ায় তাদের মধ্যে সাচ্চা দীনের মহব্বত কমে গিয়েছে।

ঘ. নবীনদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঙ. হঠকারী শাসকরা জবরদস্তী নবীনদেরকে আদর্শচ্যুত করে ফেলেছে।

চ. ইজতিহাদের ময়দানে অনুপযুক্ত লোকদের আনাগোনা । এ সকল বিষয়ই ইজতিহাদ বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে।[৩৫]

ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত

ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে, ইজতিহাদ করার প্রয়োজন নেই এমন মন্তব্য কোন মুসলিম মনীষীই করেননি। সর্বকালে সর্বযুগে ইসলামই একমাত্র বিধান। আর এ জন্যই ইসলামী শরীয়তে ইজতিহাদ এক অপরিহার্য বিষয়। আর এ অপরিহার্যতার জন্যই ইসলামে (যোগ্য ব্যক্তিবর্গের) ইজতিহাদকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, ইজতিহাদ করা প্রতি যুগে ফরযে কিফায়া। আল-মুসাফ্ফা গ্রন্থে এ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন–

ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরযে কিফায়া। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন এবং সেগুলোর শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের বিধি-ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোন বিশেষ মাযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। প্রতি যুগে ইজতিহাদ 'ফরযে কিফায়া' হবার কথা এ জন্য বলেছি যে, প্রতি যুগে যখন অসংখ্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় তখন সেগুলোর বিষয়ে আল্লাহর বিধান জ্ঞাত হওয়া ওয়াজিব, তথা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা ইতঃপূর্বে যে সব বিষয় সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সব এ নতুন সমস্যার সমাধানে সক্ষম নয়। তাছাড়াও এতে থাকে নানা রূপ মতানৈক্য। যার ফলে শরীয়তের মূল উৎসের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও মতবিরোধ অবসান করা যায় না। তাছাড়া এ বিষয়ে মুজতাহিদগণ যে নিয়ম-নীতি

নির্ধারণ করেছিলেন, তাও অকার্যকর বলে মনে হয়। অতএব, এ সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ব্যতীত উপায় থাকে না।[৩৬]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ এ প্রসংগে অন্যত্র বলেন—

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ইজতিহাদের দরজা খোলা থাকবে। কোন যুগেই তা থেমে যাওয়া বৈধ নয়; কারণ তা ফরযে-কিফায়া। কোন যুগের লোকেরা যদি এই ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে কসুর করে, এমনকি তা ত্যাগ করে বসে, তবে তারা সকলেই গুনাহগার হবে। এ কথা আমাদের 'আলিমগণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন।[৩৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একমাত্র ইসলাম প্রতিটি সমস্যার যথাযথ সমাধানে সক্ষম। আর এ কারণে তিনি যুগের বিবর্তনে উদ্ভূত সব নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ইজতিহাদ' প্রতি যুগে 'ফরযে কিফায়া'-এ ঘোষণা সে উপলব্ধিরই সাহসী উচ্চারণ। যুগে যুগে মুসলমানদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা যাতে সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে মনীষী, যুগসংস্কারক, শাহ ওয়ালী উল্লাহ সুবিস্তৃতভাবে ইজতিহাদ সম্পর্কিত বিধানাবলী তার লেখনির মাধ্যমে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। তার লিখিত *ইকদুল জীদ ফী-আহকাম-আল-ইজতিহাদ ওয়া-আল-তাকলীদ, আল-ইনসাফ-ফী-বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, আল-মুসাফফা, ইযালাতুল খিফা 'আন খিলাফত-আল খুলাফা, হুজ্জাতুল্লাহ-আল-বালিগা, বুদূরুল বাযিগা* প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তারিতভাবে এর বর্ণনা রয়েছে যা পাঠ করলে ইজতিহাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।[৩৮]

আধুনিক শিক্ষার আলোকে বর্তমান যুগে আল্লামা ড. ইকবালই সর্বপ্রথম আল-কুরআনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। মুসলিম সমাজের সর্বমুখী সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে তাকে গতিশীল করার জন্য তিনি ইজতিহাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, আধুনিক যুগের সমস্ত চিন্তাকেই আল-কুরআনের উপর ভিত্তি করে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। তার বিখ্যাত পুস্তক *Reconstruction of Religious Thought in Islam* এর এটাই মূল বক্তব্য।

আধুনিক গবেষক আবুল হাশিম বলেন, বর্তমান যুগে ইজতিহাদের গুরুত্ব নির্ধারণ করেই বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আধিমানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মক্ষেত্রে আল-কুরআনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছে।

আল-কুরআন শাশ্বত এবং সর্বযুগের উপযোগী। কিন্তু ইজতিহাদ ব্যতীত যুগে যুগে তাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মনুষ্য-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আল-কুরআন আমাদের দিয়েছে কতগুলো মৌলিক নীতি

এবং এই নীতিগুলোকে সম্মুখে রেখে ইজতিহাদের মারফতে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব দিয়েছে মানুষের বুদ্ধির উপর। রূপান্তরিত অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির এই ব্যবহারকেই ইজতিহাদ বলে। ইজতিহাদের আসল অবলম্বন আল-কুরআন। আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, তাই তাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করা চলে না। ইহা অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।[৩৯]

বিশ্বমানবের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রয়াসনিরপেক্ষ প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ সর্বাধিক প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা একদিকে যেমন আলো, বাতাস, সূর্যরশ্মি দ্বারা আমাদের ঘিরে রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি ওয়াহীর মাধ্যমে প্রেরিত জ্ঞানের দ্বারা আমাদের মানসজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে বস্তু এবং মানসজগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই বুদ্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন অপরিহার্য। বস্তুর উপর যেমন বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আল-কুরআন এবং পূর্ববর্তী সমস্ত প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানকেও ইজতিহাদের সাহায্যে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে আল-কুরআন এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানগুলোকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তার সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ স্থাপন করা এবং মানুষের আধিমানসিক ও নৈতিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বমানবকে সত্য পথের নির্দেশ দেয়া।[৪০]

উপসংহার

আল-কুরআন মানুষের জীবন পথের দিশারী; কিন্তু ইজতিহাদ ব্যতিরেকে কুরআন ও সুন্নাহ হতে যুগে যুগে নতুন সমস্যা ও যুগ জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয় দিশা তথা পথের সন্ধান লাভ করা অসম্ভব। কুরআন ও সুন্নাহ্ গবেষণা করে মুসলিম জাতি একদিন বিশ্ববাসীর শিক্ষক রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম জাতি আত্মকলহ, জ্ঞান চর্চায় শৈথিল্য ও নৈতিক অবক্ষয়জনিত বিভিন্ন কারণে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা পরিত্যাগ করে, যার ফলশ্রুতিতে ইজতিহাদ তথা ইসলামী-চিন্তার জগতে চরম বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। আর এ কারণেই মুসলিম জাতি আজ অধঃপতনের পঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে বর্তমান মুসলিম প্রজন্মকেই। তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। [৪১] আজ মুসলিম জাতির সামনে অমীমাংসিত বহু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা পুঞ্জিভূত হয়েছে। যেমন, ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বরূপ, বাক স্বাধীনতার ব্যাখ্যা, চিন্তার স্বাধীনতার গণ্ডি, গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব, বিশ্বায়ন, রক্ত-কিডনী, অংগ-প্রত্যংগ দান ও বিক্রয়, ক্লোনিং, অর্থনীতি ও সুদসংক্রান্ত

নতুন নতুন ব্যাখ্যা, আকাশ সংস্কৃতি, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতিসহ আরো ছোট বড় অনেক জিজ্ঞাসার জবাব মুসলিম চিন্তাবিদগণকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমেই দিতে হবে যাতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে নতুন সমস্যার ইসলামী সমাধান লাভ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. মাদকুর, ড. ইব্রাহীম, *আল-মু'জাম-আল ওয়াসীত*, দিল্লীঃ কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দারুল 'উলুম, দেওবন্দ, তা. বি. পৃ. ১৪২
২. আবু হাবীব, সা'দী, *আল-কামুস-আল-ফিকহী*, পাকিস্তান : ইরাদাতুল কুরআন-আল-'উলুম-আল-ইসলামিয়া, তা. বি. পৃ. ৭১
৩. গনী, মুহাম্মদ ওসমান, *আনোয়ারুল মুক্তাল্লেদীন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ১৬ ; বি. দ্র. Shafi'i, *al-Risalah*, ed, Ahmad Muhammad Shakir, Cairo: Mustafa al-Babi-al-Halabi press, 1940, p. 404
৪. *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
৫. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-মুসাফফা*, দিল্লী : তা. বি. পৃ.১১ ; শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, দিল্লী : *আল-মুসাওয়া*, তা. বি. পৃ.৭৭
৬. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *ইকদ-আল-জীদ-আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাকলীদ*, করাচী : ১৩৭৯ হি. পৃ. ৩৭
৭. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়* (অনুঃ আব্দুস শহীদ নাসিম, মূল গ্রন্থের নামঃ *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ)*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১, পৃ. ৫৩
৮. উদ্দীন, মোঃ মফিজ, *ইসলামী আইন তত্ত্বের ইজতিহাদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ.৪৮
৯. আল কুরআন, ৫৯:২
১০. আল কুরআন, ৩:১৩
১১. আল কুরআন, ৪:৮৩
১২. সারাখসী, আল্লামা, *উসূল আল সারাখসী*, ভারত : হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, তা. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮
১৩. উদ্দীন, মোঃ মফিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৪. আবু দাউদ, ইমাম, *সুনান*, পাকিস্তান : নূর মোহাম্মদ প্রকাশনী, করাচী, তা. বি. বাবুল ইজতিহাদ আল রায় ফী আল- ক্বাজা পৃ. ৫০৫
১৫. নাসাঈ, ইমাম, করাচীঃ নূর মোহাম্মদ প্রকাশনী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ২৬৪
১৬. এ হাদীসটি আমর ইবনে হারিস আল-সাকাফী মু'আয রা.-এর সহচরবৃন্দ হতে বর্ণনা করেছেন। আর সাকাফী তো কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নন। তার সম্পর্কে ইমাম শো'বা বলেন, তিনি ছিলেন মুগীরা ইবন শো'বা-এর ভাতিজা। তিনি কোন অজ্ঞাত গুণাবলীর অধিকারীও ছিলেন না। কেননা তিনি উচ্চ পর্যায়ের তাবিয়ীন-এর অন্তর্ভুক্ত; আবু আওন আল সাকাফী (মৃ. ১১৬ হি.)-এর উস্তাগণের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং তার সম্পর্কে কোন স্পষ্ট সমালোচনা নেই। সুতরাং তিনি বিশ্বস্ত ও তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এর পর তার

বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে তার সমপর্যায়ের লোকদের বর্ণনার কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সুস্পষ্ট বিরূপ সমালোচনা পাওয়া যায়, তাবিয়ীনের প্রত্যেককেই উত্তম ও বিশ্বস্ত হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। আর সাহাবাগণ, তারা তো সবসময়ই বিশ্বস্ত। তাঁদের ব্যাপারে কোন প্রকারের সমালোচনাই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। এতদ্ব্যতীত হারিসকে ইবনে হিব্বান বিশ্বস্তদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

বর্ণনাকারী হারিস থেকে কেবল ইবনে হিব্বান র. একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ যুক্তিতেও হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনার ক্ষেত্রে একাকীত্বের কারণে হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করে দেয়া সত্যপন্থীদের নীতি-বিরোধী। ইবনে আউন র. থেকে আ'মাশ, আবু ইসহাক, মাস'আর, শো'বা, আল-সাওরী ও আবূ হানীফা র. প্রমুখও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং আহলে নকদ তথা সমালোচকদের সর্ববাদী সম্মত অভিমত যে, তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

উক্ত হাদীসটি ইবনে আওন র. হতে আবু ইসহাক শায়বানী ও শো'বা ইবনে হাজ্জায বর্ণনা করেছেন। আর আবু ইসহাক থেকে আবু মু'আবিয়া দারীর এবং শো'বা থেকে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, উসমান ইবনে উমর আলী ইবনে আলজাদ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, আবদুর রহমান ইবনে আল-মাহদী, আবু দাউদ আল তায়ালাসী প্রমূখ এবং তাঁদের থেকে বহু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। এমন কি ফিকাহবিদ তাবিয়ীনও হাদীসটি সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। (মো: মফিজ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)

১৭. সারাখসী, ইমাম, *উসূল আল-সারাখসী*, দিল্লী : তা. বি. খ. ২, পৃ. ১৩৯

১৮. বযদুবী, ইমাম, ফখরুল ইসলাম, *কাশফুল আসরার আলা উসূল আল-বযদুবী*, দিল্লী : তা. বি. খ. ৪ পৃ. ২৩২

১৯. মফিজ উদ্দীন, মো:, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯-৫৬

২০. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৬০; বি. দ্র. M. Saghir Hasan Masumi, *'Istihad through fourteen centuries'*, Islamic Studies, Quarterly Journal of the Islamic Research Institute, Islamic University, Islamabad, Pakistan : Vol. xxi, winter-1982, No-4, pp. 61-63; মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর *রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

২১. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭ ; *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

২২. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০ ; *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

২৩. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২; *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

২৪. তাক্লীদ-এর শাব্দিক অর্থ গলায় বেড়ী পরানো, ধর্মমত গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীস হতে নিঃসৃত ও গৃহীত মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণামূলক অভিমত মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় তাক্লীদ বলা হয়। (বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, সাদী আবু হাবীব *আল-কামূস-আল-ফিকহী*, ইরাদাত আল-কুরআন ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়্যা, পাকিস্তান, তা.বি.; গনী মোহাম্মদ ওসমান, *আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১; ফখরুদ্দীন আল-রাযী, *আল তাফসীর আল-কাবীর*, বৈরুত:

দার-আল-ইয়াহহিয়া, আল-তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.; উদ্দীন, মাওলানা নিসার, *মাযহাব ও তাকলীদ*, ছারছীনা, বাকেরগঞ্জ, বাংলাদেশ, ১৯৬৮ খৃ. দিহলবী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, *ফুয়ুয আল-হারামাইন*, লাহোর, ১৯৪৭

২৫. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯

২৬. Masumi, *Saghir Hasan opcit,* pp.53-55

২৭. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯ ; দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *ইকদ-আল-জীদ-ফী-আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাকলীদ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯ ; *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১ ; আব্দুল কাদির, অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ, *'ইসলামে ইজতিহাদের স্থান'*, *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ.২৭৯-২৮০

২৮. *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩০. শামী, আল্লামা, *নাশরুল আরফ ফী-বিনামে বা'জিল আহকাম আল্লাল-ওরফ* - গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২-১৪৩

৩১. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯ ; শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, *ইকদ-আল-জীদ-আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাকলীদ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৪১

৩২. *মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৩৩. ইকবাল, ড. আল্লামা, *রুমুজে বেখুদী*, উদ্ধৃত, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৩৫. আব্দুল কাদির, অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০-২৮১

৩৬. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল মুসাফফা*, দিল্লী : তা. বি. পৃ. ১১

৩৭. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ; শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, *ইকদ-আল-জীদ-ফী-আহকাম আল-ইজতিহাদ ওয়া আল-তাকলীদ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৭

৩৮. রশীদ, ড. মুহাম্মদ আব্দুর, *শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী: জীবন ও চিন্তাধারা*, পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৯৮

৩৯. হাশিম,আবুল, ইজতিহাদ, *গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ.৩৫-৩৭

৪০. হাশিম, আবুল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮

৪১. Masumi, M. Saghir Hasan op. cit., pp.67-69

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই- সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৩১-৪৮

ইসলামী আইন ও বিচারে মানবিকতা ও অন্যান্য প্রসংগ

ড. মোঃ শামছুল আলম*

সারসংক্ষেপ

[ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন যে, এর সকল কর্মকাণ্ডে মানবিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়। ইসলামে সকল কিছুর উপর মানবিক মূল্যবোধের স্থান। ইসলামী আইন এবং বিচারের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। মানবতা ও মনুষত্ব ভূলুণ্ঠিত হয় এমন কোন আইন ইসলামে নেই। বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বিবেচনা করে মহান আল্লাহ আইনগুলো প্রণয়ন করেছেন। ইসলামে এমন কোন আইন নেই যার মধ্যে মানবিকতার দিকটি উপেক্ষিত। এমনিভাবে ইসলামে বিচারব্যবস্থায়ও মানবতাকে সবার উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। ইসলামে বিচার-ফয়সালার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সমাজে সুবিচার না থাকলে বিভিন্ন ধরনের অনাচার, দূরাচার, বাড়াবাড়ি, অসন্তোষ, আইন অমান্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানুষকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে বিচারের ক্ষেত্রে যেসব দূরাচার ও অনাচার সংঘটিত হচ্ছে এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে পূর্বেই ইসলাম মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বিচারে ভাল ব্যক্তিকেই ইসলাম সত্যিকারের ভাল লোক বলে আখ্যায়িত করেছে। বাংলাদেশে আইন এবং বিচার কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেওয়া হয়। এতে বিচারের মাধ্যমে মানুষের প্রতি তথা মানবতার প্রতি চরম অবিচার করা হয়। বাংলাদেশে প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে জনগণ মাঝে মাঝে এসব জানতে পারে। যেমন- মিথ্যা মামলা, সাজানো মামলা, সংশ্লিষ্ট লোককে অভিযুক্ত না করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা, মিথ্যা সাক্ষী বানানো, আইন ও বিচারকে রাজনীতি দিয়ে প্রভাবিত করা, দলীয় বিবেচনায় বিচারপতি নিয়োগ, বিচারপতিদের অবমাননা করা, জামিন প্রদানে নিরপেক্ষতা বিসর্জন, ঘুষ গ্রহণ, লঘু দণ্ডে বড় শাস্তি এবং গুরু দণ্ডে ছোট শাস্তি, রিমান্ডের নামে অমানবিক নির্যাতন ইত্যাদি। অত্র প্রবন্ধে ইসলামী অইন ও বিচারের মানবিক দিক এবং বিচারকের জন্য পালনীয় দিকসমূহ সবিস্তার আলোচনা করে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার মানবিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।]

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী আইন ও বিচারের মানবিক দিক

ইসলামের কিছু মৌলিক বিশ্বাস ও দর্শন রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মানব কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন প্রসংগ এখানে প্রাধান্য পেতে পারে না। ইসলামের লক্ষই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। যেমন–

(ক) মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ সাধন করা

মানুষ অপরাপর মানুষের কল্যাণ সাধন করবে, মহান আল্লাহ্ এ জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু সিজদার জন্য সৃষ্টি করার দরকার হলে ফেরেশতাগণই যথেষ্ট ছিল। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।"[১]

(খ) সব কিছু মানুষের জন্য

ইসলাম মানুষের জন্য, মানবতার জন্য এবং মনুষ্যত্বের জন্য। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। ইসলামী আইন ও বিচারের কথা ভিন্নভাবে বলার দরকার নেই। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[২] এখানেও মানবতারই জয়গান করা হয়েছে। ইসলামে মানুষই সব, মানুষের জন্যই সব। এ জন্য মানুষের প্রতি কোন রকমের অবিচার মহান আল্লাহ্ সহ্য করেন না। এসব চেতনা ও দৃষ্টিভংগি থেকেই মহান আল্লাহ্ আইন-কানূন ও বিচার ব্যবস্থা দিয়েছেন, যাতে মানবতা সর্বোচ্চ উপকৃত হয় এবং কোন অবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার শিকার না হয়।

(গ) রিসালাত ব্যবস্থা মানুষের জন্য

ইসলামী আইনের উৎস অহীর জ্ঞান, যা রিসালাত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে। নবী-রসূল এবং আসমানী কিতাবসমূহ সব কিছু মানুষের জন্য। আসমানী কিতাবসমূহে এমন একটি আইনও নেই যা মানুষের জন্য বেমানান, অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইসলামী আইনের মধ্যেও মানবীয় দিকটি সবার উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য দেখা যায়, ইসলামের প্রত্যেক নবী নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মানবিক মূল্যবোধে শানিত একজন ব্যক্তি ছিলেন। আর তাদের এ মানবিক দিকটি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, দল, গোত্র বা গোষ্ঠীর জন্য ছিল না। তারা মানুষের মধ্যে কোন রকম বিভেদ সৃষ্টি হতে দিতেন না। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "আমাকে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি পাঠানো হয়েছে।"[৩]

(ঘ) ইসলামী আইন এবং বিচার শিক্ষামূলক এবং দৃষ্টান্তমূলক

এখানে শাস্তির জন্য শাস্তি দেওয়া হয় না বরং মানুষের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রতীকী বিচার করা হয়। মানুষের শিক্ষা যেহেতু অন্যতম একটি উদ্দেশ্য তাই

বিচারের সময় মানুষের একটি দল যাতে এ শাস্তির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে ইসলাম সেই বিধান রেখেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুমিনদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৪] ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু আইন ও বিচার ছিল প্রতীকী ও দৃষ্টান্তমূলক তাই সেখানে শাস্তির ঘটনা খুব কমই ঘটেছে।

(ঙ) নিরপেক্ষ

সত্যিকারের নিরপেক্ষতা বলতে যা বুঝায় ইসলামী আইন তা-ই। মহান আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ স.-কে দিয়ে ইসলামী আইন ও বিচার কার্যকর করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে নযীর স্থাপন করেছেন। বিশেষত তিনি ইসলামী আইন ও বিচার কার্যকর করার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আইনের চোখে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হয়। এখানে সাদা-কালো, আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরীব, সরকারী-বেসরকারী ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "জেনে রেখো! অনারবের উপর 'আরবের কিংবা 'আরবের উপর অনারবের, কাল মানুষের উপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের উপর কাল মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ।[৫] রসূলুল্লাহ্ স. একবার জমি সংক্রান্ত একটি মামলায় একজন মুসলিমের মোকাবেলায় একজন ইয়াহূদীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। মোটকথা আল্লাহর রসূল স. আইন ও বিচারের মাধ্যমে মানবতাকে শীর্ষে তুলে ধরেছেন। ইসলাম যে মানুষ আর মানবতার জন্য তা তিনি শতভাগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার একজন কুরায়শ বংশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়লে, তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে সে মহিলার শাস্তি লাঘব করার জন্য নবী স.-এর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন সাধারণ লোক অন্যায় করলে তার শাস্তি হতো অথচ কোন মর্যাদাবান লোক অন্যায় করলে তার শাস্তি হতো না। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ স.-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।"[৬] সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী আইন ও বিচারে কোন ধরনের বৈষম্য নেই। বৈষম্য যেহেতু একটি অমানবিক শব্দ, কাজেই ইসলামের মত জীবনাদর্শে তা একান্ত ভাবেই বেমানান।

(চ) ভারসাম্যপূর্ণ

ইসলামের আইন ও বিচারসহ সকল কিছুতে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে এক আইনের সাথে অন্য আইনের চমৎকার সমন্বয় রয়েছে। এক আইন অন্য আইনের পরিপূরক। শুধু তাই নয় বরং যে পরিমাণের অপরাধ শাস্তিও সে ধরনেরই হয়ে থাকে।

(ছ) মানুষের জীবনকে নিরাপদ করে

ইসলামী আইন ও বিচার মানুষকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইসলামী আইন ও বিচার পরোক্ষভাবে মানুষকে সাবধান বাণী শুনিয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে বলেন, "হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[৭]

(জ) মানব মর্যাদা প্রদান

মানবিক মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি ও মূল্য প্রদান ইসলামের একটি বিশেষ দিক। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে। ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদার যথার্থ স্বীকৃতির মাধ্যমে সমাজে সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ইসলামের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[৮] অতএব আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমেই মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এভাবে ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, "Human being was given superiority over the angels and every human being however low his position and status may be in his society is very much respectable before Allah, his creator, at whose biddings even the angels had to salute him. Such achoknowledgement is the source of all position, reprussion and exploitation."[৯]

(ঝ) শান্তি ও স্থিতিশীলতা স্থাপনই মূল উদ্দেশ্য

আমরা জানি 'ইসলাম' শব্দটি 'সিলমুন' ধাতু হতে উদ্ভূত। যার অর্থ শান্তি, সন্ধি, নিরাপত্তা, আনুগত্য, মান্য, গ্রহণ ইত্যাদি। আইনের মাধ্যমে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের আইন প্রয়োজন মহান আল্লাহ্ সে ধরনের আইনই ইসলামের মাধ্যমে আমাদের দিয়েছেন।

(ঞ) সুবিচারপূর্ণ

বিচারের মাধ্যমে যদি পরকালিন কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে ইসলামী আইন ও বিচারের মাধ্যমেই তা সম্ভব। ইসলামী পরিভাষায় সুবিচারের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার কোন বিকল্প শব্দ হতে পারে না। 'আদল' (عدل) শব্দটিকে বাছাই করে মহান আল্লাহ যে, সবচেয়ে বড় বিচারক তা আবারও প্রমাণ করেছেন। মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল,

ন্যায়বিচার, সাম্য ও ইনসাফ। মানবিক মূল্যবোধের অভাবের ফলশ্রুতিতে এখন সর্বত্র অবিচার আর যুলম চলছে। কিন্তু ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যেসব মূলনীতির ওপর ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান একটি হলো এ 'আদল। প্রাক-ইসলামী যুগে 'আদলের অভাবে মানুষ পশুবৎ হয়ে পড়েছিল।
বাংলাদেশের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিচার অনুপ্রবেশ করেছে। কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র একই চিত্র। অন্য দিকে অনেকেই অবিচার ও অত্যাচারের শিকার হয়ে আর্তচিৎকার করছে। ন্যায়-বিচারের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথাও সর্বতোভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত নেই।

আরবী 'আদল' (عدل) শব্দটির অর্থ-সমান করা, ন্যায়বিচার, সুবিচার, ইনসাফ, কোন কিছুকে দাবিদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া, যাতে কেউ কম-বেশি না পায়। 'আদল মানে মানুষকে সমানভাবে দেখা, সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া। যে যেখানে যতটুকু পাবে তাকে ততটুকু দেওয়াই 'আদল। ইসলামের আদল শুধু কাঠগড়ায়ই সীমিত নয়, বরং জীবনের সর্বত্র আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন-যাত্রায়ও আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু নামায পড়লে যেমনি 'আদল হবে না, আবার নামায বাদ দিয়ে অন্যসব কিছু করলেও জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে 'আদল এর সমন্বয় সাধন করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর দেওয়া আইন সকলের জন্য সমান। সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা উচিৎ। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে।"[১০] অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার-নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক- আর তা হচ্ছে 'আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। অসত্য যার বিপক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার ঘোর বিরোধী। আমার দীনে কারও জন্য কোন পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন-পর, ছোট-বড়, ভদ্র-অভদ্রদের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ, তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হারাম তা সবার জন্যই হারাম, যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। ইসলামের এ মানবিক মূল্যবোধের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্ত্বাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। মহানবী স. নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এভাবে, "তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিচু শ্রেণীর অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচু পর্যায়ের

অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।"[১১]

আল্লাহর নির্দেশমালার মধ্যে 'আদলের স্থান সবার উপরে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন।"[১২] সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঐচ্ছিক ধরনের কর্মসূচি নয়। এটি অপরিহার্য একটি বিধান।

বিভিন্ন কারণে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তার মধ্যে একটি হলো স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতমূলক নীতি দর্শন। এমতাবস্থায় অনেকেই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার কর, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর।"[১৩]

কুরআনের বহু স্থানে 'আদল' প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। আর ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীগণ আল্লাহ্র পছন্দের লোক। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।"[১৪] মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সকল মানুষের প্রতি সুবিচার। অর্থাৎ ইসলামী আইন সকলের জন্য সমান। রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের ওপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এতে কারো প্রতি কোন পক্ষপাতমূলক আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচারনীতি অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়। সকল মানুষের সাথে সমান সম্পর্ক রাখতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার আইনের এ সর্বব্যাপী নির্দেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসংগে 'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈক মহিলা চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তা কুরায়শ বংশের লোকদেরকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। সাহাবীগণ বলাবলি করছিলেন, এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে কে কথা বলতে পারবে? তারা বললেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর প্রিয় পাত্র উসামা রা. ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা ইব্ন যায়দ রা. রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন ঃ "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। কেননা যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিতো। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার ওপর শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লহর

কসম! মুহাম্মদ স.-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে অবশ্যই মুহাম্মদ স. তার হাত কেটে দিতেন।"[১৫] বনী ঈসরাইলের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "বনী ঈসরাইলের ধ্বংসের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, যখন তাদের উচু শ্রেণীর লোকেরা অপরাধ করত তখন ছাড়া পেয়ে যেত আর নীচু শ্রেণীর লোকেরা যখন অপরাধ করত তখন শাস্তি কার্যকর করা হতো।"[১৬] বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এখানেও অনেক ক্ষেত্রে ওপর মহলের লোকেরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে আবার যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই তাদের ওপরই আইন কার্যকর করা হচ্ছে। অথচ ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[১৭]

ন্যায়পরায়ণ খলীফা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। পক্ষান্তরে যালিম রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত। এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ "ন্যায়পরায়ণ খলীফা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। আর যালিম রাষ্ট্রপ্রধান কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে। অধিকন্তু সে আল্লাহ্র দরবার থেকেও বহুদূরে অবস্থান করবে।"[১৮] অপর এক হাদীস হতে জানা যায়, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দিবসেও সে সব লোক মহান আল্লাহ্র ছায়া পাবে যারা ন্যায়পরায়ণ শাসক। যে দিন মহান আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। মহানবী স. নিম্নোক্ত হাদীসে সৌভাগ্যবান সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের প্রথম শ্রেণী হলো ন্যায়বিচারক শাসক। তিনি বলেছেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সে দিন ছায়া দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক।..."[১৯] অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, ন্যায়পরায়ণ লোকদের আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পাশে স্থান দিবেন। মহানবী স. বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে নূরের তৈরী একটি মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। তারা যখন দায়িত্বে ছিল তাদের শাসনে এবং পরিবারে ইনসাফ কায়েম করেছিল।"[২০]

মানুষ যাতে বিচার-ফয়সালায় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল স. অনেক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় কথা-বার্তা বলেছেন। এক হাদীসে শ্রেষ্ঠ বিচারককে সেরা মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিচারে ভাল, সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[২১] আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, দু' পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়ার মাধ্যমে সাদাকার সমান সওয়াব লাভ করা যায়। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তুমি সুবিচার কর। দু' পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়া সাদাকা (স্বরূপ)।"[২২]

বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধের অবনতি ও অবক্ষয়ের আরেকটি দিক হল ইনসাফের দেউলিয়াত্ব। এ অবস্থা যেন সর্বত্র বিরাজ করছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। অথচ ইসলামে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. এদিকে সর্তক করে বলেছেন, 'পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এটা ছিল যে, তারা ইনসাফ করতো না। 'আম্মার ইবন ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ এক সংগে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।"[২৩] 'নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা' অর্থ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচারনীতি ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং এ ব্যাপারে এতদূর চরমপন্থা অবলম্বন করা সমীচীন নয় যে, মানুষ নিজে নিজেকেও ক্ষমা করবে না।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে সৎকর্মশীল সকল লোকের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ হয় এবং আল্লাহ্র আইন লংঘন, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত কাজ ইত্যাদি পরিহার করার পথে কোন বাঁধা প্রতিবন্ধকতা থাকে না, বস্তুত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সাথে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, ততক্ষণ অপর লোকের প্রতি কোন সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের যাচাই-পরীক্ষা নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় সে অপরের সঠিক ও নির্ভুল যাচাই কি করে করতে পারে? সুতরাং সর্বপ্রথম নিজেকে দেখা, যাচাই-পরীক্ষা করা ও নিজের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এটি করলে অতঃপর অপরের অন্যায়ের যাচাই ও পরীক্ষা করা তার পক্ষে সহজ হতে পারে।[২৪] উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলাম্মা বদরুদ্দীন 'আইনী লিখেছেনঃ "হযরত 'আম্মার বর্ণিত এই হাদীসে সমস্ত কল্যাণ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তুমি যখন তোমার নিজের প্রতি ইনসাফ করবে, তখন তুমি তোমার স্রষ্টার এবং তোমার ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক চূড়ান্ত কল্যাণই লাভ করতে পারবে। সমস্ত মানুষকে যখন তুমি সালাম দিবে, তখন তোমার চরিত্রও উন্নত হবে, মানুষের মন জয় করতে পারবে।"[২৫]

ন্যায়বিচারের জায়গা শুধু আদালত বা কোর্ট নয়। ইসলামে 'আদল' বা ন্যায়বিচার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর দ্বারা সর্বত্র ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা বুঝায়। ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্ত হলোঃ সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো, অংগ-প্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে ব্যবহার, একাধিক স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি সমান আচরণ করা, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমান চোখে দেখা ইত্যাদি। এমন একটি ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছেড়ে দিয়েছে বা অবহেলা করছে; যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।"[২৬]

ন্যায়বিচারের অভাবে অবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিশেষত বনী-ইসরাঈলের পতনের অন্যতম একটি কারণ ছিল এটি। তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য এক ধরনের বিচার করত। আবার অসহায় ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য আরেক রকম বিচার করত। এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ এই ছিল যে, তাদের সম্ভ্রান্ত লোকের চুরি করলে মাফ পেয়ে যেত...।"[২৭] কোন সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ন্যায়-বিচারের অভাবে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যায়। অপরাধীরা তাদের অন্যায়-অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মহানবী স. সেদিকে ইংগিত করে বলেছেন, "যদি কোন জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে।"[২৮] সর্বোপরি যে কোন বিবেচনায় সর্বত্র 'আদল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাহলে অনেকাংশে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবাই তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[২৯] ইসলামের বক্তব্য হলো বিচার করলে 'আদলের সাথেই করতে হবে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে বলেন, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৩০] সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এর মাধ্যমেই মানব সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দুর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর।[৩১]

(ট) আমানত

ইসলামী আইন মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট আমানত। অতএব আইনকে সঠিক স্থানে রাখাই আমানতদারি। সমাজ ও রাষ্ট্রের সবাই যখন সুবিচার পাবে তখনই আমানত রক্ষা করা হবে। নচেৎ খুব বড় ধরনের খিয়ানত হয়ে যাবে। আমানতের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে।"[৩২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "হে মুমিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ করো না।"[৩৩]

(ঠ) মুত্তাকী হতে সহায়তা করে

অনেকগুলো ভাল কাজের মাধ্যমে মানুষ সত্যিকারের মুত্তাকী হতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো 'তাকওয়া,। তাকওয়া অবলম্বনের জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সুবিচার কর। কারণ এটি তাকওয়ার খুব নিকটতর।"[৩৪] আর তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা বিকাশ লাভ করে।

(ড) উদার

ইসলামী আইন বিশ্বে প্রচলিত যে কোন আইনের তুলনায় উদার। এতে কোন রকমের সংকীর্ণতা, অমানবিকতা, বর্বরতা, নৃসংশতা ও পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে মানবিকতার আলোকে। অর্থাৎ যা মানুষের জন্য সহণীয় তা-ই দেওয়া হয়েছে। যে বয়সে যে বিধানটি কার্যকর করা যায় সে বয়সেই সে বিধানটি দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষকে উদার করে তোলে। ইসলামী আইন যে কোন ধরনের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে।

(ঢ) সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন

ইসলামী আইন শুধু মুসলিম জাতির জন্য নয়। এটি মানুষের জন্য, মানবতার জন্য ও মনুষ্যত্বের জন্য। এসব না জানার কারণে অনেকে মনে করে যে, ইসলামী আইন বাস্ত বায়িত হলে অমুসলিম অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। মূলত তাদের এসব ধারণা কাল্পনিক ও বাস্তবতাবিবর্জিত। মহানবী স. মদীনায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে সকল ধর্মের লোক ছিল। ইয়াহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিউপাসক, মূর্তিউপাসকসহ সকল শ্রেণীর মানুষ ইসলামী রাষ্ট্র ও আইনের অধীনে ছিল। আল কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান উৎস। আল-কুরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "রমযান মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য দিশারী।"[৩৫] মানবতার মহান বন্ধু তাঁর কোন কথা, আইন বা কর্মকান্ড দিয়ে প্রমাণ করেননি যে, তিনি শুধু মুসলমানের নবী। বরং তাঁকে তাঁর মহান স্রষ্টা নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন, "বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল।"[৩৬] যেহেতু মুহাম্মদ স. মানুষের নবী তাই তিনি তাঁর সম্বোধনে কাউকে বাদ দেননি। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৩৭] আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মদ স.-কে সকল কিছুর জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনের ২৪১ স্থানে اَلنَّاسُ (নাস) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা-ও একবচন ব্যবহার করা হয়নি বরং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল মানুষের কথা বলা হয়েছে। আর একবচন হিসেবে اَلْاِنْسَانُ (ইনসান) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৬৫ স্থানে। অন্যদিকে মানুষের আরেকটি আরবী শব্দ হলো اِنْسٌ (ইনস), যা আল-কুরআনে ১৮ বার উল্লেখ করা

হয়েছে। সর্বোপরি মানুষের কল্যাণের জন্যই কুরআন তথা ইসলামী আইন। কুরআনের সর্বত্র মানবতার জয়-জয়কার। সত্যিকার অর্থে ইসলাম একটি আদর্শ জীবন বিধান; যা বাস্তবে সার্বজনীন এবং প্রয়োগে সনাতন। ইসলাম সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে এক অনন্য সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।[৩৮] ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। স্থান বা কাল ভেদে এর উপযোগিতায় কোন ধরনের সংকট সৃষ্টি হয় না।

সাম্য : মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ইসলামের আইন সবার জন্য সমান। কারণ আইনের দৃষ্টিতে সবাই মানুষ। অন্য কিছু নয়। অন্য কথায় ইসলামী আইন সাম্যবাদী। এ প্রসংগে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী তিব্বতের নির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা দালাইলামা অকপটে উচ্চারণ করেছেন, "Islam is indeed an all inclusive faith and is universal. Islam is as natural as you and I are --- to get along with others, respect others, not create a mess for other people or mess our own people. Islam is live and let live. Islam is easy to live and is simply peace."[৩৯] সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদানে ইসলামের বিকল্প নেই। ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলামী আইন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র। ইসলামের মৌল মানবিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অন্য সব মূল্যবোধ এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্য ও গণতন্ত্রের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয় বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও মানবের উপকারার্থে অবদানের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ চর্মকার, অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।[৪০]

(ত) আদালতের মাধ্যমেই বিচার করতে হবে

রাস্তা-ঘাটে, পাড়া-মহল্লায়, বাড়ির উঠানে ইত্যাদি জায়গায় ইসলামী আইন কার্যকর করা যায় না। আদালতের মাধ্যমে আইন ও রায় কার্যকর করতে হবে। আদালতের

বাইরে আইন কার্যকর করা হলে তা নিকৃষ্ট ও অমানবিক বিচার হিসেবে পরিগণিত হবে। চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, পকেটমারকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলা বড় ধরনের গর্হিত ও অমানবিক কাজ। ইসলামে এসব মানবতাবিরোধী বিচারের কোন জায়গা নেই।

(থ) পরিবেশ-পরিস্থিতি গুরুত্ব বহন করে

ইসলামী আইন যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, যার-তার উপর কার্যকর করা যায় না। বরং তা কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী না হলে সেখানে ইসলামী আইন কার্যকর হবে না। কারণ তা গ্রহণ করার মত মন-মানসিকতা মানুষের সৃষ্টি হতে হবে। তার মানে মানুষের সুবিধা সবার আগে দেখতে হবে। আরো বলা যায়, কোন সমাজে কারো অভাব পূরণের পূর্বে সে অভাবজনিত কোন অন্যায়ের জন্য আইন কার্যকর করা যাবে না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, অভাবী ব্যক্তি চুরি করলে চুরির দায়ে তার হাত কাটা যাবে না। অতএব সমাজে পূর্বেই এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যেন কারো অভাব না থাকে। এমনিভাবে সে সমাজে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না যেখানে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য সমস্ত আয়োজন করে রাখা হয়েছে। এমনিভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিকে দোররা মারার ব্যাপারটিও ইসলামী আইন সম্মত নয়। কারণ বাংলাদেশে এখনও সে অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। সে ধরনের কর্তৃপক্ষ এখানে নেই। অতএব মানবিক ধারণ ক্ষমতার বাইরে ইসলামী আইনের প্রয়োগ সম্ভব নয়।

(দ) ভাল মানুষের পরিচয় বহন করে

ইসলাম সে সব লোককে সেরা বলেছে যারা বিচারের সময় মানুষের সাথে মানবিক আচরণ করে। এ প্রসংগে মহানবী স. বলেছেন, "সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে মানুষের প্রতি বিচারে উত্তম।"[৪১] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, "মুসলিমদের মধ্যে সে উত্তম যে বিচারে উত্তম।"[৪২] আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালায় সর্বোত্তম"।[৪৩]

(ধ) সাক্ষ্য দানে মানবিকতা

বিচারে সাক্ষ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাক্ষ্য দানে সততা না থাকলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"[৪৪]

(ন) ক্ষমা গুণ

ক্ষমা মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম। ক্ষমার উপর কোন মহত্তর গুণ নেই। অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া বড় মহত্ত্বের লক্ষণ। তবে হ্যাঁ, যদি ক্ষমা পেয়ে অপরাধী আরো অপরাধে উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে ক্ষমা না করাই উত্তম। সর্বোপরি অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে সর্বদা মানবতা বিজয়ী হয় না বরং ক্ষমার মাধ্যমে মানবতা ও মনুষ্যত্ব বিজয়ী হয়। নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে ফেলতে পারলে আদালত বা থানা পর্যন্ত না যাওয়াই উত্তম। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, এসব জায়গা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই কল্যাণ। ইসলামে মানবিক কারণে ক্ষমার রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। দয়া, মায়া, ক্ষমা ও উদারতা মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণ। আরবী 'আফউ' عفو শব্দের অর্থ ক্ষমা করা। ইসলামী পরিভাষায় 'আফউ' হলো, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। তিনি ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবাধ্য গুনাহ্‌গার বান্দাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর কাজে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই, এতদ্‌সত্ত্বেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁকে এবং তাঁর দেওয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকারই করে না। বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শিরকের ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ্‌ রসূলুল্লাহ্‌ স.-কে এগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"[৪৫] মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেন, "তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[৪৬] মানুষকে ক্ষমার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমা আশা করা যায়। আল্লাহ্‌ বলেছেন, "তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৭] প্রতিটি মানুষের জন্য দয়া ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। দয়ামায়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুলত্রুটি মুক্ত নয়। কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্‌র বাণী, "তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।"[৪৮] অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাকওয়া লাভের উপায় এবং ক্ষমা তাকওয়ার নিকটবর্তী গুণ। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "মাফ করে দেওয়াই তাকওয়ার

নিকটতর।"[৪৯] মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ স. অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।"[৫০]

(প) যৌক্তিকতা

ইসলামী আইন ও বিচারের প্রতিটি পর্যায় খুবই যৌক্তিক। এর কোন আইনকে কখনো বেখাপ্পা ও বেমানান মনে হবে না।

(ফ) তুলনামূলক সহজ

ইসলামী আইন সহজ, সরল, সহনীয় ও ন্যাচারাল। এতে জটিলত, কঠোরতা ও বেমানান কিছু নেই। এ আইন প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

বিচারকের জন্য পালনীয় মানবিক দিক

ইসলামী আইন ও বিচারের মত বিচারককেও এখানে কিছু মানবিক দিকের প্রতি নযর রাখতে হয়। যেমন–

(ক) প্রভাবান্বিত না হওয়া

ইসলামী আইন ও বিচার বাস্তবায়নে কোন ধরনের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া থেকে মহান আল্লাহ্ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও।"[৫১] আল-কুরআনের ভাষ্যমতে প্রভাবান্বিত না হওয়া শুধু মানবিক দায়িত্বই নয় বরং এটি ঈমানী দায়িত্ব।

(খ) ক্ষুব্ধ অবস্থায় রায় না দেওয়া

ইসলামী মূল্যবোধে বিচারককে কিছু নিয়ম মানতে হয়। রায় প্রদানের সময় তাকে মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। বিশেষতঃ ক্ষুব্ধ অবস্থায় করা যাবে না। তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত রায় হয়ে যেতে পারে। মানুষ সুবিচার নাও পেতে পারে। রসূলুল্লাহ্ স. এই প্রসংগটিও বাদ দেননি। তিনি বলেন, "এমতাবস্থায় তুমি দু'পক্ষের মধ্যে রায় দিও না যে, তখন তুমি ক্রোধান্বিত।"[৫২] বিচার-ফয়সালা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। বিচারকের সামান্য অমনোযোগের ফলে যথাযথ রায় না-ও হতে পারে। এ জন্য বিচারকদের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। বিচারকালিন সময়ে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "ক্রোধাবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বিচার করা বিচারক বা কাযীর জন্য শোভনীয় নয়।"[৫৩] আল্লাহ্ভীতি মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে থাকে। বিচার-ফয়সালায় মহান আল্লাহ্কে ভয় করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। তাহলে অবিচারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তুমি যখন তোমার বিচারের সময় রায় দিবে তখন

আল্লাহ্‌কে ভয় করবে।"[৫৪] সমাজে যেসব কারণে রক্তপাত সংঘটিত হয় তার মধ্যে একটি হলো সুবিচারের অনুপস্থিতি। কেউ সুবিচার না পেলে দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। এ জন্য যে কোন মূল্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রসূলুল্লাহ্ স. উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "কোন জাতির মধ্যে যদি সুবিচার করা না হয়; তাহলে তাদের মধ্যে রক্তারক্তি ছড়িয়ে পড়ে।"[৫৫] আজকাল অর্থের বিনিময়ে রায় পাল্টানোর কথা শোনা যায়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বিচারের ক্ষেত্রে তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। রসূলুল্লাহ্ স. এ ব্যাপারেও সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "বিচারে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন।"[৫৬] স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতির কারণে অনেক সময় বিচারক নিয়োগে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যার ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। বিচারালয়ে নৈরাজ্য দেখা যায়। বিচারক নিয়োগে সততা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা উচিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেউ বিচারক হতে পারে না।"[৫৭]

ইসলামে বিচার-ফয়সালার ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রসূলের মত মহান ব্যক্তিত্বও দু'আর মধ্যে ভুল বিচার করা হতে পানাহ চাইতেন। জনৈক সাহাবী রা. বলেন, "মহানবী স. ভুল বিচার করা হতে পানাহ চাইতেন।"[৫৮] বাংলাদেশে প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায় যে, ভুল রায়ে নিরপরাধ লোক বহু বছর ধরে জেল খাটছে। ক্রোধ ও রাগের বলগাহীন অপব্যবহার বহু অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড মানুষ ক্রোধ ও রাগের কারণে করে ফেলে। কিন্তু পরবর্তীতে এর কারণে অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হতে হয়। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয় তাহলো যার বিরুদ্ধে রায় যায় তার মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় চরমভাবে, যা তাকে কখনো ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বিচারকের জন্য উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সম্বরণ করা এবং অকারণে রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ না করা। ক্রোধের মত ক্ষতিকর ও অমানবিক বৈশিষ্ট্য হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মহানবী স. সুন্দর একটি হাদীস বলেছেন। তিনি বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি বীর নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করতে পারে। বরং সেই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[৫৯] রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেছেন, "গোস্বা শয়তানের তরফ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী। আর আগুনকে পানি ঠান্ডা করে। যদি কেউ গোস্বা হয় তবে তার উচিত অযূ করে নেওয়া।"[৬০]

(গ) তাড়াহুড়ো না করা

শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাড়াহুড়া করা। তাড়াহুড়ার মাধ্যমে অনেক সময় এমন রায় হয়ে যায় যে, সত্যিকারের ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ জন্য বিচারকদের

ঠাণ্ডা মাথায় রায় দিতে হবে। অন্যথায় মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। মহানবী স. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তড়িঘড়ি (অস্থিরতা) হলো শয়তানের পক্ষ থেকে।"[৬১]

উপসংহার

পরিশেষে এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে মানবিক দিকটি প্রাধান্যযোগ্য। যেহেতু ইসলাম, নবী, আসমানী কিতাব, হাদীসসহ সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য, তাই এতে মানুষের অধিকার ও সহজাত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা যেমনিভাবে অতি মাত্রায় মানবিক তেমনি সাধারণ আইনের প্রয়োগেও মানবিক দিকটিকে ইসলাম সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। অতএব বিচার ব্যবস্থায় প্রচলিত অনিয়ম, অবিচার, অনাচার, হয়রানি, স্বজনপ্রীতি, নিয়মবহির্ভূত ব্যাপারসমূহ দূরীকরণে ইসলামের শিক্ষা প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। আইন প্রয়োগে এবং বিচার কার্যকরণে মানুষের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যথায় বিচারালয় শেষ আশ্রয়স্থল হওয়ার পরিবর্তে নিপীড়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. كُنتُم' خَيرَ امَّةٍ اخرجَتْ' لِلنّاس আল কুরআন, ৩:১১০
২. هُوَ الذِى خَلَقَ لكُم مَا فِى الأرض جَمِيعًا আল কুরআন, ২:২৯
৩. বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* অধ্যায়: তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ: ১, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০.
৪. وَلْيَشهَد' عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤ'مِنِينَ আল কুরআন, ২৪:২
৫. الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى নু'মানী, শিবলী, *সীরাতুন্নবী,* আযমগড় : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৫২, পৃ. ১৫৪
৬. انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) فعلت ذالك لقطعت يدها বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, অধ্যায়: হুদূদ, অনুচ্ছেদ: ১১-১২,
৭. وَلَكُم فِى القِصَاص حَيَاةٌ يَا اولِى الالبَابِ لعَلَّكُم تَتَّقُونَ আল কুরআন, ২:১৭৯
৮. وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِى ادَمَ আল কুরআন, ১৭:৭০
৯. Bhuiyan, Mahbubur Rahman, *The Appeal of Islam,* Chittagong: Islamic Cultural Centre, 1980, p. ৩৩
১০. وامرتُ لاعدل بينكم আল কুরআন, ৪২:১৫
১১. انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف ، والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد (ص) فعلت ذالك لقطعت يدها বুখারী, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়: হুদূদ, অনুচ্ছেদ: ১১, ১২,
১২. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاىٔ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى আল কুরআন, ১৬:৯০

১৩. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله আল কুরআন, ৫:৮
১৪. واقسطوا ان الله يحب المقسطين আল কুরআন, ৪৯:৯
১৫. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* রিয়াদঃ দারুস্‌সালাম, ২০০০, অধ্যায়ঃ হুদূদ, হাদীস নং-৮, ৯
১৬. নাসাঈ, ইমাম, *সুনান,* কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২, অধ্যায়ঃ সারিক, অনুচ্ছেদঃ ৬,
১৭. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل আল কুরআন, ৪:৫৮
১৮. হাম্বল, আহমদ ইবনে, ইমাম, *আল-মুসনাদ,* কায়রোঃ মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫, খ. ৩, পৃ. ২২
১৯. سبعة يظلّهم الله فى ظلّه يوم لا ظلّ الاّ ظلّه امام عادل... মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ যাকাত, হাদীস নং-৯১
২০. انّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمان ، الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وما ولّوا মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ ইমারত, হাদীস নং- ১৮
২১. মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ মুসাকাত, হাদীস নং- ১১৮-১২২
২২. ان يعدل بين الاثنين صدقة ، تعدل মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ যাকাত, হাদীস নং-৫৬
২৩. বুখারী, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ২০,
২৪. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, *হাদীস শরীফ,* ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, খ. ১, পৃ. ৬২
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৬. انّ الله يامر بالعدل والاحسان وايتاىٔ ذى القربى আল কুরআন, ১৬:৯০
২৭. انما هلك بنو اسرائيل حين كانوا اذا اصاب الشريف... নাসাঈ, *সুনান,* অধ্যায়ঃ সারিক, অনুচ্ছেদঃ ৬
২৮. ولا حكم قوم بغير الحقّ فشا فيهم الدم মালিক, ইমাম, *মু'য়াত্তা,* কায়রো : ১৩৭০ হি. অধ্যায়ঃ জিহাদ, হাদীস নং- ২৬,
২৯. إنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالاحسَانِ وَاِيتَاىٔ ذِى القُربى وَيَنهَى عَنِ الفَحشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغىِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ আল কুরআন, ১৬:৯০
৩০. وَاِذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ اَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ আল কুরআন, ৪:৫৮
৩১. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَو عَلى انفُسِكُم اوِالوَالِدِينِ وَالاَقرَبِينَ اِن يَّكُن غَنِيًّا اَو فَقِيرًا فَاللهُ اَولى بِهِمَا আল কুরআন, ৪:১৩৫
৩২. اِنَّ اللهَ يَامُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلى اَهلِهَا আল কুরআন, ৪:৫৮
৩৩. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُم وَاَنتُم تَعلَمُونَ আল কুরআন, ৮:২৭
৩৪. اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوى আল কুরআন, ৫:৮
৩৫. شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنزِلَ فِيهِ القُراٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ আল কুরআন, ২:১৮৫
৩৬. قُل يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيكُم جَمِيعًا আল কুরআন, ৭:১৫৮
৩৭. وَمَا اَرسَلنَاكَ اِلاَّ رَحمَةً لِّلعَالَمِينَ আল কুরআন, ২১:১০৭
৩৮. মিয়া, মোঃ আবদুল হালিম, *সমাজকল্যাণ পরিক্রমা,* ঢাকা, হাসান বুক হাউস, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬
৩৯. Dalai Lama, Kim Vo, For Harmony of Religions,Dhaka: *The New Nation,* 28th April, 2006, p. 6
৪০. আলী, শাহেদ (সম্পাদিত), *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা,* সিলেট : ১৯৬৭, পৃ. ১৪-১৫

৪১. خير الناس خيرهم قضاء মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. অধ্যায়: মুসাকাত, হাদীস নং-১১৮-১২২,

৪২. فانّ خير المسلمين احسنهم قضاء নাসাঈ, ইমাম, *সুনান,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়: 'বুয়ূ', অনুচ্ছেদ: নং- ৬৪

৪৩. فانّ خير عباد الله احسنهم قضاء মুসলিম, ইমাম, *আস্‌সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়: মুসাকাত, হাদীস নং-১১৯

৪৪. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسطِ وَلاَ يَجرِمَنَّكُم شَنَانُ قَومِ عَلَى الاَّ تَعدِلُوا আল কুরআন, ৫:৮

৪৫. خُذِ العَفوَ وَامُر بِالعُرفِ وَاَعرِض عَنِ الجَاهِلِينَ আল কুরআন, ৭:১৯৯

৪৬. فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم আল কুরআন, ৩:১৫৯

৪৭. وَاِن تَعفُوا وَتَصفَحُوا وَتَغفِرُوا فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল কুরআন, ৬৪:১৪

৪৮. وَسَارِعُوا اِلَى مَغفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالارضُ اُعِدَّت لِلمُتَّقِينَ ، اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحسِنِينَ আল কুরআন, ৩:১৩৩-১৩৪

৪৯. وَاَن تَعفُوا اَقرَبُ لِلتَّقوَى আল কুরআন, ২:২৩৭

৫০. لا تثريب عليكم اليوم সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০০, পৃ. ৭২২, ৭২৪

৫১. وَلاَ تَاخُذكُم بِهِمَا رَافَةٌ فِى دِينِ اللهِ اِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الاخِرِ আল কুরআন, ২৪:২

৫২. لا تحكم بين اثنين وانت غضبان মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আকযিয়া, হাদীস নং- ১৬,

৫৩. لا ينبغى للقاضى ، للحاكم ان يحكم بين اثنين وهو غضبان মুসলিম, ইমাম, *আসসহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আকযিয়া, হাদীস নং-৯

৫৪. فاتّق الله عند حكمك اذا حكمت ইবনে মাজা, ইমাম, *সুনান,* দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. অধ্যায়: যুহদ, অনুচ্ছেদ: ১,

৫৫. لا حكم قوم بغير الحق الاّ فشا فيهم الدم মালিক, ইমাম, *মু'আত্তা,* প্রাগুক্ত, অধ্যায় : জিহাদ, হাদীস নং-২৬

৫৬. لعن الله الراشى والمرتشى فى الحكم হাম্বল, ইমাম আহমদ ইবনে, *আল-মুসনাদ,* প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮৭, ৩৮৮

৫৭. لا حكيم الا ذو تجربة বুখারী, ইমাম, *সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আদাব, অনুচ্ছেদ : ৮৩,

৫৮. كان النّبى (ص) يتعوّذ...من سوء القضاء নাসাঈ, ইমাম, *সুনান,* অধ্যায়: ইসতি'আযাহ্‌, অনুচ্ছেদ: ৩৪, প্রাগুক্ত,

৫৯. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. الاناة من الله والعجلة من ا لشيطان তিরমিযী, ইমাম, *সুনান,* রিয়াদ: দারুস্‌ সালাম, ২০০০, অধ্যায় : বিরর, অনুচ্ছেদ: ৬৫

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৪৯-৭০

মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

সারসংক্ষেপ

[মহানবী মুহাম্মদ স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় জনহিতকর কল্যাণ রাষ্ট্র। তাঁর পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে বিভাগগুলো ছিল অর্থপ্রশাসন সেসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগ ছিল অত্যন্ত সুসংহত ও স্বচ্ছ। রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল অর্থপ্রশাসনের উপর অর্পিত। তাঁর পরিচালিত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সাহাবীগণ ছিলেন একাধারে দক্ষতা, সততা, দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল নমুনা। জনগণের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতির সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি ছিল আরো অধিক প্রবল। ফলে অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় দুর্নীতিমুক্ত অর্থপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। মহানবী স.-এর জীবনাদর্শ যেহেতু সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ, কাজেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের শক্তিশালী অর্থপ্রশাসনের নমুনা কীরূপ ছিল, তার বৈশিষ্ট্যই বা কী ছিল এবং তার আয়ের উৎসই বা কী– এসব বিষয় অবগত হয়ে কীভাবে তা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে বিশেষত রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা যায় সেলক্ষেই মূলত এ প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রবন্ধে মহনবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসনের বৈশিষ্ট্য, বায়তুলমালের পরিচয়, বায়তুলমালের আয়ের উৎস এবং বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাবলী ও ইসলামী সমাধান স্থান পাবে।]

---

* সহকারী অধ্যাপক, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

১. জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি

মহানবী স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসন ছিল বিশ্ব ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর বিষয়। এ প্রশাসনের ভিত্তিমূলে ছিল– তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি। আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতিই কার্যত রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সকল প্রকার অন্যায়, যুলুম ও শোষণ তথা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল।

২. সম্পদের মালিকানা আল্লাহর

মহানবী স. প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের মৌলিক দর্শন ছিল পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ও আমানতদার মাত্র। মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাঁর নির্দেশিত পথে সম্পদ উপার্জন, সংরক্ষণ ও ভোগ-ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে শর্ত সাপেক্ষে সম্পদে তার সীমিত মালিকানা স্বীকৃত। **প্রথমতঃ** সম্পদ কতিপয় ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নয় বরং তা সকল মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত ও ব্যয়িত হতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেনঃ "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[১] **দ্বিতীয়তঃ** ধন-সম্পদ উপার্জন করতে হবে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত হালাল উপায়ে, হারাম পথে করা হলে তা হবে খিলাফতের দায়িত্বের সুস্পষ্ট লংঘন। আল্লাহ তাআলা বলেন : "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না"।[২] **তৃতীয়তঃ** হালাল পথে অর্জিত সম্পদ শুধু নিজ স্বার্থ, নিজ পরিবার-পরিজনই নয় সমাজের অন্য সকলের কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেও না, তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেও না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"[৩] **চতুর্থত :** স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস কিংবা অপচয় কোনটাই করার অধিকার ইসলামে নেই। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না"।[৪]

৩. জনকল্যাণ সাধন

তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও খিলাফতের ভিত্তির উপর মদীনা রাষ্ট্রের যে অর্থপ্রশাসন গড়ে উঠেছিল তার লক্ষ ছিল অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, যুলুমের অবসান, মৌলিক প্রয়োজনের নিশ্চয়তাদান, সুষম বণ্টন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া। কেননা মানব সৃষ্টির লক্ষই হচ্ছে, মানুষের কল্যাণ সাধন। তাই আল্লাহ্ বলেন: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে"।[৫]

৪. অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। ফলে জনগণ তাদের অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণ দূরীকরণের লক্ষ্যে মহানবী স. তাঁর অর্থপ্রশাসনে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। একই সাথে মানব কল্যাণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো এবং অর্থপ্রশাসনের কোথাও যাতে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হয় এবং যুলুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হতো। আল্লাহ বলেন : "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে"।[৬]

বর্ণিত আয়াতের আলোকে বলা যায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমর বিল মারূফ-এর অর্থ হবে, সর্ববিধ উপায়ে শোষণমুক্ত ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নাহি আনিল মুনকার-এর অর্থ হবে, অর্থনৈতিক যুলুমের সকল উপায় ও ছিদ্র পথ বন্ধ করে দেয়া।

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের আওতায় অমুসলিম নাগরিকদের উপর করারোপ করার বিষয়টি ছিল ইনসাফের দাবি। কেননা মুসলিম নাগরিকদের ন্যায় অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টিও ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই মুসলিম জনগণের উপর যাকাত আবশ্যক হলে অমুসলিমদের জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দান কোন দিক থেকে ইনসাফের পর্যায় পড়ে না। তারপরও তাদের পক্ষ থেকে জিযিয়া ব্যতীত অপর কোন কর আরোপ করা হতো না।

৫. অপচয় ও অপব্যবহার রোধ

সম্পদের সদ্ব্যবহার অর্থপ্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুগত ও মানব সম্পদ উভয়বিধ সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছিল। ফলে সর্বধরনের অপচয় রোধ

করা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন : "তুমি কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ"।[৭]
আলোচ্য আয়াতে 'তাবযীর' বা অপব্যয় বলতে হারাম খাতে ব্যয় করাকে বুঝানো হয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের বাহবা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না। তাই ইসলামে অপব্যয় নিষিদ্ধ।

অপর এক আয়াতে অপব্যয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন: "তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে"।[৮]
মোটকথা, মহানবী স. প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় মধ্যম পন্থা ও কৃচ্ছ্রতা অনুসরণ করা হতো।

৬. পেশা গ্রহণে স্বাধীনতা

মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসন যে অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অবাধ সুযোগ ছিল। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী স.ও যথোপযুক্ত স্থানে সাহাবীগণকে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ দিতেন। এ রাষ্ট্রে বেকার এবং অভাবগ্রস্তদের কর্মসংস্থান কিংবা ভাতা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৭. নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনীতি স্বাধীন হলেও তা অবাধ ছিল না। কারণ ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়ে থাকে। ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির সীমিত স্বাধীনতা স্বীকার করলেও নিরংকুশ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। ফলে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এতে সুনিশ্চিত ছিল।

৮. বায়তুলমাল রাষ্ট্রের আমানত

মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ছিলেন বায়তুলমালের আমানতদার। তারা অনাড়ম্বর সাদা-সিধে জীবন যাপন করতেন। তারপরও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কড়া নজর রাখা হতো। অর্থপ্রশাসনে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং সাধারণ নাগরিক তথা সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত ছিল।[৯]

৯. সুষম বণ্টনের নিশ্চয়তা

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি ছিল আল কুরআন– যাতে রাজস্ব ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্পদ উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিভিন্ন ম্যাকানিজমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়, সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং শ্রেণী সংঘাতের অবসান ঘটে। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন ও আয়ের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এছাড়াও ইসলামে নিষিদ্ধ বস্তুর উৎপাদন ও আয় হারাম বলে বিবেচিত। ইসলাম সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষে মজুদদারী সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে।

১০. সুদমুক্ত অর্থনীতি

মদীনা রাষ্ট্রে পুরোপুরি সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। মদীনার ব্যবসায়ীরা কখনো নিজ অর্থ লগ্নী করে, কখনো অন্যের নিকট থেকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে, কখনো শরীকানা ভিত্তিতে, কখনো বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতো। সে সময় আধুনিক কালের ন্যায় ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েম ছিল না। অর্থনৈতিক লেনদেনে সর্বধরনের সুদ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে মানুষ সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে: "যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে- ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [১০]

১১. বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় হতদরিদ্রদের অধিকার লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা ছিল। ফলে একদিকে সম্পদ পবিত্র করার ব্যবস্থা ছিল এবং অপরদিকে দরিদ্রদের হাতে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে যেতো। আল্লাহ বলেন: "এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"।[১১] অপর এক আয়াতে আছে : "অতএব আত্মীয়কে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম"।[১২] ফলে তদানীন্তন সমাজের দরিদ্র লোকজন তাদের পূর্ণ আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেছিল। মহানবী স. প্রবর্তিত

অর্থপ্রশাসনের অন্যতম লক্ষ ছিল বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠান। মদীনা রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে সমাজে যারা দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ববোধকে নাড়া দিয়েছিল। যাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তারা তাদের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও ভাগ্যাহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের লক্ষে তা ব্যয় করতে নিজেদের বাধ্য মনে করতো। সমাজের বিত্তহীন অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআনী নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ফলে পরবর্তীকালে এর ধারাবাহিকতায় যাকাত গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এ ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর শাসনামল বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কেন্দ্রিয় অর্থভাণ্ডার হিসাবে বায়তুলমাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ, কোষাগার। পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। এটি রাষ্ট্রীয় অর্থপ্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। মহানবী স. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের সরকারি অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। এটিই মূলত রাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় অর্থভাণ্ডার-বায়তুলমাল।[১৩]

এ বায়তুলমাল দেশের জনগণের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিয় অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষে গঠিত হয়েছিল। এটি ছিল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত সম্পদ।[১৪] ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল জনগণের আমানত। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের বর্তমান ধারণা (concept) অনুযায়ী কেন্দ্রিয় ব্যাংক স্বরূপ।

মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্রের শুভ জয়যাত্রা যে দিন হয়েছিল সেদিন থেকেই মূলত বায়তুলমালের উন্মেষ ঘটে। প্রথম দিকে বায়তুলমালে কোন অর্থ-কড়ি জমা করা হতো না কিংবা জমা রাখার অবকাশও ছিল না। ফলে বায়তুলমাল সংরক্ষণের নিমিত্তে পৃথক কোন ভবনও গড়ে ওঠেনি। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করেই মূলত বায়তুলমালসহ প্রশাসনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো।[১৫]

বায়তুলমালের কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও সকল কর্মকাণ্ড মহানবী স.-এর সরাসরি তদারকীতে পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে অঞ্চলভিত্তিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুসারেই মূলত আঞ্চলিক শাখাগুলো পরিচালিত হতো।[১৭] যারা বায়তুলমালের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন তাদের বেতন-ভাতা বায়তুলমাল থেকেই পরিশোধ করা হতো। তবে খিয়ানতের ব্যাপারে চরম কঠোরতা অবলম্বন করা হতো।[১৮]

মহানবী স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হবে তার একজন স্ত্রী থাকবে, তার যদি খাদেম না থাকে, তবে একজন খাদেম রাখতে পারবে এবং তার যদি বসবাস করার মত কোন বাসস্থান না থাকে, তবে সে একটি বাসস্থান পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী স. আরো বলেছেন– যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে, সে হবে খিয়ানতকারী ও চোর"।[১৯] মহানবী স. বিভিন্ন উৎস থেকে বায়তুলমালের প্রাপ্ত আয় পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন এবং তা থেকে বরাদ্দ দিতেন।

বায়তুলমালের আয়ের উৎসসমূহ

বায়তুলমালের আয়ের প্রধান প্রধান উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১. যাকাত, ২. উশর, ৩. সাদাকাতুল ফিতর, ৪. ওয়াক্ফ, ৫. আল-গানীমাহ, ৬. আল-ফাই, ৭. মুক্তিপণ, ৮. উপহার সামগ্রী, ৯. জিযিয়া, ১০. খারাজ, ১১. নাওয়াইব, ১২. আমওয়াল আল-ফাদিলা, ১৩. সাধারণ দান-খয়রাত এবং ১৪. কর্জ।[২০] বর্ণিত উৎসসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. যাকাত

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধান উৎস। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বহুবার নামাযের সাথে যাকাতের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে নামায যেমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তদ্রূপ যাকাতও। শরীয়তের লক্ষ হচ্ছে মানুষের ইহকালীন ও পরকলীন জীবনের কল্যাণসাধন এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যাবতীয় ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে জীবন রক্ষা করা। যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শরীয়তের এ লক্ষ্যই অর্জিত হয়। কেননা যাকাতদাতা যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দাতার গুণে ভূষিত হয় এবং কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে মনকে পবিত্র করে নেয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে ধনী ব্যক্তিরা অহংকার থেকে মুক্তি পায় এবং বিনয়ী হওয়ার গুণাবলী অর্জন করে। এতে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজ জীবনে কায়েম হয় শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সংহতি। যাকাত আদায় যেহেতু বাধ্যতামূলক, তাই যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানালে সম্পদের মালিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিধান ইসলাম অনুমোদন করেছে।[২১]

যাকাত ব্যবস্থাকে আল্লাহ সম্পদশালীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও পাপ মোচনের মাধ্যম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের দু'আ করবে। তোমার দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[২২]

যাকাত আদায়ের নির্দেশ মক্কায় নাযিল হলেও তার সবিস্তার বিধান ও ব্যবস্থা নাযিল হয় মদীনায়। প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবাগণ মক্কায় ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তা সংগ্রহ ও বন্টন করার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যাকাতের নিসাব, পরিমাণ, সম্পদের গুণাবলী এবং তা ব্যয়ের খাতসমূহ ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাকাতদাতা ও যাকাতগ্রহীতা উভয়ের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার লাভের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

যাকাত প্রত্যেক ধনবান মুসলিম ব্যক্তির আদায় করা ফরয বিধায় সমষ্টিগতভাবে তা ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের মাধ্যমে আদায় করতে হয়। মদীনা রাষ্ট্রে এজন্যই একটি সুষ্ঠু যাকাত প্রশাসন গড়ে ওঠেছিল। যাকাত আদায়ের লক্ষে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। যাকাত বাবদ যে সম্পদ আদায় হত তা রক্ষণাবেক্ষণে মহানবী স.-এর নির্দেশক্রমে কেন্দ্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করতেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ও যুহাইর ইবনে সাল্‌ত রা.।[২৩]

যাকাত আদায় নিশ্চিত করার লক্ষে মহানবী স. নবম হিজরী সনের ১ মুহাররম প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক যাকাত আদায়কারী নিয়োগ দেন। নিয়োগপ্রাপ্ত কয়েকজন যাকাত আদায়কারী হলেন–

মদীনা মুনাওয়ারায় উমর রা., আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. নাজরান, আমর ইবনুল 'আস রা. ওমান, ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হাযরামাওত, আবু মূসা আল-আশ'আরী রা. ইয়ামান, মালিক ইবনে আওফ রা. হাওয়াজিন, উয়ায়না ইবনে হিসন রা. তামীম গোত্র, বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রা. আসলাম ও গিফার গোত্র, আববাদ ইবনে বিশর রা. সুলায়ম ও মুযায়না গোত্র, রাফী ইবনে মাকীস রা. যুহায়না গোত্র, আয-যাহহাক ইবনে সুফিয়ান রা. বনু কিলাব, বুসর ইবনে সুফিয়ান রা. বনু কা'ব, ইবনুল লুতবিয়া আযদী রা. বনু যুবরান, আদী ইবনে হাতিম তাঈ রা. বনু তায়্যি ও বনু আসাদ, আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা রা. বনু লাইস, মালিক ইবনে উসমান সাকাফী রা.তায়েফ, কুররাহ ইবনে হুবায়রা রা বনু কুশায়র ও জাদাহ গোত্র, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বনু কালব, আমির ইবনে মালিক রা. বনু আমির, আল-হারিস ইবনে আওফ রা. বনু মুররাহ, আকরা ইবনে হাবিস রা. বনু দারিম, মালিক ইবনে নুওয়ায়রাহ রা. বনু ইয়ারবু।[২৪]

কুরআন মাজীদে যাকাত আদায়কারীদের 'আল-আমিলীন' বলা হয়েছে।[২৫] এছাড়াও তাদেরকে মুসাদ্দিক, সুয়াত, জুবাত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহানবী স. তাঁর নিজ পরিবার এবং বংশের যে কোন ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম

ঘোষণা করেছিলেন। এজন্যই তিনি তাঁর বংশের কাউকে যাকাত প্রশাসনের কোন কর্মকাণ্ডে কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করেন নি।[২৬]

যাকাত আদায়কারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের প্রাক্কালে মহানবী স. যাকাত আদায় সম্পর্কিত লিখিত নির্দেশনামা প্রদান করতেন। যাকাত আদায়কারীদেরকে যথোপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হতো। যাকাতদাতাদের নিকট থেকে কোন প্রকার উপহার সামগ্রী গ্রহণ ছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[২৭] বর্ণিত আছে যে, ইবনুল লুতবিয়া আল-আযদী নামক এক ব্যক্তিকে বনু যুবরান গোত্রে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি লোকজনের নিকট থেকে কিছু উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে মহানবী স.-কে আদায়কৃত যাকাতের সম্পদ জমা দেয়ার সময় বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আদায়কৃত যাকাত আর এগুলো লোকেরা আমাকে উপহার দিয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন: তুমি তোমার বাড়ি থাকাকালীন সময়ে লোকেরা তোমাকে এসব উপহার সামগ্রী দেয়নি কেন? একথা বলে তিনি সমুদয় সম্পদ বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেন এবং সকল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে কোন প্রকার উপহার সামগ্রী গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সকল কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করেন।[২৮]

যাকাত বাবদ সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারেও মহানবী স. যাকাত আদায়কারীদের সতর্ক করে দেন এবং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। যাকাত ব্যয়ের খাত স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "সাদাকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর পথে যারা সংগ্রামে নিয়োজিত ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। [২৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, যাকাত আদায়ের যে আটটি খাত উপরে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে ছয়টি খাতই দারিদ্র্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মহানবী স.-এর সাধারণ নিয়ম ছিল, যে অঞ্চলের বিত্তবানদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করতেন সে অঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝেই তা বণ্টন করে দিতেন। যদি আদায়কৃত যাকাতের সম্পদের কিছু অংশ উদ্বৃত্ত থাকত তা কেন্দ্রিয় বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো।

২. উশর

'উশর' শব্দটি আরবি। আভিধানিক অর্থ এক-দশমাংশ। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। উশর যাকাতের ন্যায় আদায় করা ফরয। মুসলিম অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতই মূলত উশর। বৃষ্টিতে সিক্ত ভূমি হতে ফসলের এক-দশমাংশ ও যেসব জমিতে অন্যভাবে সেচ দিয়ে জমি সিক্ত করতে হয়

তা থেকে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ ফসল আদায় করা হতো। উশর ফরয হওয়ার বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের সংকল্প করো না অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবার নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৩০]

উল্লেখ্য যে, জমি যদি উশরী হয় তবেই উশর আদায় করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে জমি উশরী হয়–

(১) যে জমির মালিক মুসলিম, তার জমি উশরী, (২) কোন দেশ বিজয়ের পর সে দেশের জমি যদি মুসলিমদের মাঝে বন্টন করা হয় তবে সে জমি উশরী, (৩) অনাবাদী জমি, কোন মুসলিম যদি তা আবাদ করে তবে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। উশর কখনো কখনো পণ্যে আবার কখনো কখনো নগদ অর্থেও আদায় করা হতো। যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ একই সাথে উশরও আদায় করতেন। তবে কখনও কখনও উশর আদায়ের নিমিত্তে পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগের দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যেত। এ ধরনের কর্মকর্তাকে 'সাহিবুল উশর' বলা হতো।[৩১] কিলাব ইবনে উমাইয়া লায়সীকে সাকীফ গোত্রে এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহল রা.-কে হাওয়াজিন গোত্রে উশর আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[৩২] উল্লেখ্য যে, মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল খেজুর। মৌসুমে খেজুর বৃক্ষের উৎপন্ন খেজুরের উশর আদায়ের হিসাব কেন্দ্রিয়ভাবে রাখতেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.।[৩৩]

৩. সাদাকাতুল ফিতর

রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদের দিন বিত্তশালীদের উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে 'সাদাকাতুল ফিতর' বলে। যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তিকে তার নিজের, পরিবারবর্গ ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে দরিদ্র মানুষের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী স. মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের উপর সাদাকাতুল ফিতর এক সা (প্রায় সাড়ে তিন কেজি) খেজুর কিংবা এক সা যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, লোকেরা (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করে নেয়।[৩৪]

৪. ওয়াকফ্

ওয়াকফ্ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আওকাফ। মানব কল্যাণের লক্ষে প্রবর্তিত ইসলামের এক অনন্য বিধানের নাম ওয়াক্ফ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কোন বস্তু আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে দরিদ্রদের মাঝে কিংবা যে কোন জনহিতকর খাতে দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়। এটি হচ্ছে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতার ইন্তিকালের পরও তার ওয়াক্ফ মানব কল্যাণে বহাল থাকে। এ ব্যাপারে নবী স. বলেন, "মানুষের ইন্তিকালের পর তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়ঃ (১) সাদকায়ে জারিয়া, (২) এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে"।[৩৫]

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মুসলিম জাতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষে এই সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। স্বয়ং মহানবী স. ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনসহ অধিকাংশ সাহাবা থেকে ওয়াক্ফ করার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে উমর রা. বলেন, উমর রা. খায়বার যুদ্ধে একখণ্ড জমি লাভ করেছিলেন। তিনি উক্ত জমি সম্পর্কে মহানবী স.-এর নিকট জানতে চান যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খায়বরে একখণ্ড জমি লাভ করেছি, যা অপেক্ষা উত্তম জমি আর পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী পরামর্শ দেন? জবাবে তিনি বললেন : "তুমি চাইলে এর মালিকানা নিজের কাছে রেখে দিবে এবং এর উৎপাদিত পণ্য সাদকা করে দিবে। তখন উমর রা. তা সাদকা করে দিয়ে বললেন : এই জমি বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না বরং এর মাধ্যমে গরীব, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তিকরণে, আল্লাহর পথে, মুসাফিরদের জন্য এবং অতিথি সেবায় ব্যয় করা যাবে। এই সম্পদ যিনি তত্ত্বাবধান করবেন তিনি ন্যায়সংগতভাবে তা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবেন কিন্তু মূলধন সরবরাহকারী (মালিক) হিসেবে খেতে পারবেন না"।[৩৬] পরবর্তীতে এসব সম্পদের আয় বায়তুলমালে জমা হতো।

৫. আল-গানীমাহ্

গানীমাহ্ শব্দের অর্থ-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, গনীমতের মাল ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ- মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত পরাজিত অমুসলিমদের নিকট থেকে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, উট, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তগত করা হত তা সবই গনীমতের সম্পদ হিসেবে গণ্য। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকালে এটি ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উৎস। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পরিত্যক্ত যে সমস্ত সম্পদ হস্তগত হত সেগুলো একত্র করে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মহানবী স. রাষ্ট্রের জন্য রেখে অবশিষ্ট

চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মাঝে দায়িত্ব ও পদমর্যাদা অনুযায়ী বন্টন করে দিতেন। গনীমতের মাল তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন মুআইকিব ইবনে আবু ফাতিমা রা.।[৩৭]

মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় সেনা সদস্যদের সুনির্দিষ্ট বেতন-ভাতা না থাকায় গনীমাত সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে কার্যত বেতন-ভাতা দেয়া হতো। এর মাধ্যমে মুসলিম সৈনিকগণ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারতেন এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের সুযোগ লাভ করতেন।

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে : "আরো জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান"।[৩৮]

গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মহানবী স. ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ, অনাথ, দীন-দরিদ্র, মুসাফির এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হতো। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, মহানবী স. এক-পঞ্চমাংশকে তিন ভাগ করতেন। এ তিন ভাগের এক ভাগ মহানবী স.-এর জন্য, এক ভাগ মহানবী স.-এর পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। অবশিষ্ট একভাগ বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো এবং তা থেকেই মূলত ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয়িত হতো। ইমাম শাফেঈ র. বলেন, মহানবী স. তাঁর জীবদ্দশায় গনীমতের মালের যে অংশ গ্রহণ করতেন তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[৩৯]

৬. আল-ফাই

মহানবী স. প্রবর্তিত রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল আল-ফাই। মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অমুসলিমরা তাদের জমি জমা, বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ ইত্যাদি ফেলে রেখে পালিয়ে যেত এবং যা কার্যত যুদ্ধ -বিগ্রহ ছাড়াই মুসলিমদের দখলে এসে যেত - এরূপ সম্পদকে আল-ফাই বলা হয়। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তাদের (ইয়াহূদীদের) নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফাই দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"।[৪০]

এ আয়াতে যে ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে তা প্রথমে বনু নাযীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসে।

সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহুবলে এ সম্পদ মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসেনি বরং আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবীদের দান করেছেন। তাই এ সম্পদ গনীমতের সম্পদ থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। কাজেই গনীমতের ন্যায় তা সৈনিকদের মাঝে বন্টন করা হয় না। কুরআন মাজীদে আল-ফাইকে বায়তুলমালের উৎস বলা হয়েছে এবং এ সম্পদ ব্যয়ের খাত সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর"।[৪১]

৭. মুক্তিপণ

মুক্তিপণ মদীনা রাষ্ট্রের বায়তুলমালের আয়ের অন্যতম উৎস। কোন যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় অর্জনের পর প্রায়শই যুদ্ধবন্দী আসতো। এদের মধ্যকার খুব কমসংখ্যক লোককেই দাস বানানো হতো। মহানবী স. কখনো কোন কিছুর বিনিময় ব্যতিরেকে আবার কখনো মুক্তিপণ গ্রহণপূর্বক মুক্তি দিতেন। যুদ্ধ বন্দীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকতেন। বদরের যুদ্ধের বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয় এবং আদায়কৃত মুক্তিপণ বায়তুলমালে জমা দেয়া হয়।

৮. উপহার সামগ্রী

মহানবী স. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট থেকে উপহার সামগ্রী লাভ করতেন। উক্ত উপহার সামগ্রী বায়তুলমালের অন্যতম আয়ের উৎস ছিল।

৯. জিযিয়া

অমুসলিমদের জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের জন্য যে নির্দিষ্ট কর প্রদান করতে হয় তাকে জিযিয়া বলা হয়। মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়েছিল। এ জিযিয়া মূলত নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। সামরিক বাহিনীতে মুসলিম নাগরিকদের যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক, পক্ষান্তরে অমুসলিম নাগরিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হতো। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নয় এবং

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া না দেয়"।[৪২]

জিযিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত খাজনা নয়। কেননা দরিদ্র অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হতো না। এছাড়া শিশু, মহিলা, পঙ্গু, অসহায়, ধর্ম প্রচারক প্রমুখের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া হতো না। খাজনা হলে ধনী-দরিদ্র কেউই অব্যাহতি পেত না। সামর্থ্যবান পুরুষদের নিকট হতে প্রতি বছর ১ দীনার জিযিয়া আদায় করা হতো। উল্লেখ্য যে, যে সব অমুসলিম সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে, তাদের জিযিয়া প্রদানের প্রয়োজন নেই। জিযিয়া হতে যে অর্থ আয় হতো তা বায়তুলমালে জমা হতো এবং সামরিক বাহিনীর কল্যাণে ব্যয় করা হতো।

১০. খারাজ

মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল খারাজ (Land Tax)। খারাজ হচ্ছে অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করা ভূমি কর। অমুসলিম কৃষিজীবী নাগরিকদের উপর মহানবী স. এ কর ধার্য করেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা জরুরি শর্ত। খায়বর বিজয়ের পর মহানবী স. সর্বপ্রথম সেখানকার ইয়াহূদিদের উপর খারাজ ধার্য করেন।

ইয়াহূদিরা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ও খারাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে। ইসলামী রাষ্ট্র ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে আলোচনা সাপেক্ষে খারাজের অংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতো।

দু'টি পদ্ধতিতে খারাজ আদায় করা হয়: (১) আনুপাতিক খারাজ- যা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে আদায় করা হতো এবং (২) নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ- যা জমির পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হতো।

আনুপাতিক খারাজ সাধারণত কোন ফসল আসার পরপরই আদায় করা হতো। জমির উৎপাদন ক্ষমতা, ফসলের বিভিন্নতা ও সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবেচনায় এনে খারাজ নির্ধারণ করা হতো। জমির মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেলে উক্ত জমির খারাজ দিতে হতো না। খারাজের যাবতীয় অর্থ মহানবী স. সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। উল্লেখ্য যে, একজন বিবাহিত সৈনিক একজন অবিবাহিত সৈনিকের দ্বিগুণ বেতন পেতেন।[৪৩]

১১. নাওয়াইব

রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিত্তবান মুসলিমদের নিকট হতে যে লেভী গ্রহণ করা হয় তাকে নাওয়াইব বলা হয়। যেমন, তাবূক যুদ্ধের পূর্বে মহানবী স. ধনাঢ্য সাহাবাগণের নিকট থেকে এ ধরনের দান গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী স.-এর ঘোষণার পর মুসলিমগণ তাতে তাৎক্ষণিক সাড়া দেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পদের স্তূপ গড়ে ওঠে। আবূ বকর রা. সর্বস্ব নিয়ে আসেন এবং তা পরিমাণে ছিল ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম। উমর রা. তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। উসমান রা. সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন।[৪৪] বালাযুরী বলেন, তার পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) দিরহাম।[৪৫] এছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাহাবী প্রচুর অর্থ-কড়ি দান করেন।

১২. আমওয়াল আল-ফাদিলা

উত্তরাধিকারী বিহীন কোন মুসলিমের সম্পত্তি বা ওয়ারিসবিহীন সম্পত্তি, ধর্মত্যাগী ও পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রচুর অর্থ বায়তুলমালে জমা হতো। এগুলো আমওয়াল আল-ফাদিলা নামে পরিচিত।

১৩. দান-খয়রাত

প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সময়মত দান-খয়রাত ছিল মদীনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। এ খাত মদীনা রাষ্ট্রের আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার সময়ও প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য যে, মহানবী স. একবার নও মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আহবান জানালে সবাই তাদের সাহায্যে ছুটে আসেন। কেউ খাদ্য, কেউ কাপড় এবং কেউ কেউ বিপুল অর্থ নিয়ে আসেন।[৪৬]

দান-খয়রাত যাকাতের ন্যায় অপরিহার্য না হলেও ইসলাম তা অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। এ দান-খয়রাত কখনো ব্যক্তিগত আবার কখনো সমষ্টিগত- এই দু'ভাবে আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে দানকারী নিজ হাতে তা বন্টন করে দিবে পক্ষান্তরে সমষ্টিগতভাবে দানকারী তা বায়তুলমালে জমা দিবে। দান-খয়রাত উত্তোলন ও বন্টন উভয়বিধ কাজই মহানবী স. স্বয়ং নিজে করতেন। বায়তুলমালে দান-খয়রাত খাতে যে বিপুল অর্থ আদায় হত তা যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর তত্ত্বাবধানে থাকতো।

১৪. কর্জ

মহানবী স. মক্কা বিজয়ের পর জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কর্জ (Loan) গ্রহণ করেন। হাওয়াজিন যুদ্ধের পূর্বে মহানবী স. আবদুল্লাহ ইবনে রবী'আর নিকট থেকে ৩০,০০০

(ত্রিশ হাজার) দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেন। অপর একটি সূত্রে ২০,০০০ (বিশ হাজার) দিরহামের কথা উল্লেখ আছে।[৪৭] হুনায়নের যুদ্ধের সময় মহানবী স. সাফওয়ান নামক এক অমুসলিমের নিকট থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) টি বর্ম ধার করেন, এটাও বায়তুলমালের সাময়িক উৎস হিসেবে বিবেচিত।

উপরোক্ত খাতসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ লাভের মাধ্যমে মহানবী স.-এর রাষ্ট্রীয় অর্থপ্রশাসন গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাবলী

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জনে কতগুলো মৌলিক সমস্যা রয়েছে। নিম্নে সমস্যা ও তার ইসলামী সমাধানের বিষয় আলোচনা করা হলো-

সমস্যাবলী

- ধন বন্টন বৈষম্য
- পর্যাপ্ত উৎপাদন না হওয়া
- সীমাহীন অপব্যয়, দুর্নীতি ও কালো টাকার দৌরাত্ম
- বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি এবং
- বেকারত্ব

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা সুদ নির্ভর। কাজেই যারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে নানা ধরনের পথনির্দেশের প্রস্তাবনা জাতির সামনে উপস্থাপন করেন, বিভিন্ন চটকদার Prescription দিয়ে থাকেন তারা না আমাদের জীবন দর্শনে আস্থাশীল না আমাদের হিতৈষী। আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ মূলত আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এ কাজে তাওহীদবাদী মুসলমানই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।[৪৮] উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান কীভাবে হতে পারে অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতিতে এর কী সমাধান রয়েছে সে বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো-

অর্থব্যবস্থার ইসলামী সমাধান

ধন বন্টনে বৈষম্য দূরীকরণ

ধন বন্টনে বৈষম্যের পথ ধরেই সমাজে হতাশা, বঞ্চনা ও শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে অসহায় ও বঞ্চিতদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই ধন বন্টনে বৈষম্য দূরীকরণ একান্ত অপরিহার্য। ধন বন্টনে সাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃতের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের ভাগ-

বাটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাহেলী যুগে পৃথিবীতে সম্পদ বন্টনের কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা বিদ্যমান ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম মৃতের সম্পদ তার আত্মীয়-স্বজন তথা নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝে বন্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা পেশ করেছে। বণ্টন শাস্ত্র অনুযায়ী মৃতের সম্পদ আইনত স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ খুবই কম। ফলে একদিকে যেমন ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে নির্যাতন, বঞ্চনা ও হতাশা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় ধন বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে।[৪৯]

পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বিশ্বমানের অনেক নিচে। ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন দূরে থাক, খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকার সুদমুক্ত কৃষি ঋণ দিতে পারেন। শিল্প-কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে মালিকরা প্রথমেই শ্রমিক শোষণের চিন্তা করে আর শ্রমিকরাও তেমনি ন্যায্য-অন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষে ঘেরাও ধর্মঘট, কর্মবিরতি ইত্যাদি ধরনের কর্মসূচি পালন করে। পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে এ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠতে হবে এবং নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প উদ্যোক্তাদের লোভী আচরণ, চোরাচালানের প্রতিরোধ, সরকার কর্তৃক সঠিক শিল্পনীতি গ্রহণ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি এবং সরকারি আমলাদের শিল্পবিরোধী তৎপরতা দূর করতে হবে।[৫০]

সীমাহীন অপব্যয়, দুর্নীতি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্যরোধ

অপচয়, অপব্যয় ও দুর্নীতি উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুগপৎভাবে অন্তরায়। যেমন, সরকারি অফিস আদালতে প্রত্যহ যে পরিমাণ কাগজ নষ্ট হয় তার পরিমাণ বিপুল। একইভাবে মিউনিসিপ্যালটির বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরববাহ করা লাখ লাখ ব্যারেল পানি দৈনিক নর্দমায় চলে যায়। অপরদিকে আছে প্রতিটি সেকটরের সীমাহীন দুর্নীতি। দুর্নীতির আরেক ভয়াবহ চেহারা হচ্ছে কালো টাকা। উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বেই এর বিস্তার ও বিধ্বংসী রূপের বহি:প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ হাজার হাজার কোটি কালো টাকার ভারে নুব্জ। যে সব উপায়ে এক শ্রেণীর লোকের হাতে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা সঞ্চিত হয় সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে সরকারি তহবিল সেরূপও পরিত্যক্ত সম্পত্তি জবরদখল, চোরাচালান, মাদকব্যবসা, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল দান, কর ফাঁকি

দেওয়া, পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুবাদে আয়, টেন্ডার জালিয়াতি ও নিম্নমানের নির্মাণ কাজ, ঘুষ ও চাঁদাবাজী, পারমিট লাইসেন্স হস্তান্তর ইত্যাদি অন্যতম। এসব থেকে বাঁচার একমাত্র পথ শরীয়তের বিধি পরিপালন।[৫১]

বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ

স্বাধীনতা অর্জনের সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে পরিমাণ ঘাটতি ছিল এখন তা কয়েক হাজার গুণ ছাড়িয়ে গেছে। সেই ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষে প্রয়োজন অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী রোধের পাশাপাশি কঠোরভাবে চোরাচালান প্রতিরোধ করা। বিদেশে নির্ভরতা হ্রাসের জন্য কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াসও অব্যাহত রাখতে হবে, পাশাপাশি বিদেশে আমাদের পণ্য সামগ্রির বাজার খুঁজতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বেকারত্ব

বাংলাদেশে আজ অগণিত লোক বেকার। বেকারত্বের অভিশাপে গোটা অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পুঁজির যোগান পেতে হলে উদ্যোক্তাকে বিত্তশালী হতে হবে। প্রার্থিত পুঁজির কিংবা সম-পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা বেশি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখা না গেলে পুঁজি মিলে না। এ কারণে সুদী অর্থব্যবস্থায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যে বিনিয়োগ পুঁজির তীব্র সংকট দেখা দেয়। এ অবস্থায় যার যথেষ্ট জামানত দেবার সমার্থ্য আছে সেই শুধু পুঁজি পাবে এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্য ফুঁলে-ফেঁপে ওঠবে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির অনন্য অবদান। এ অবস্থায় পুঁজির যোগানদার ও উদ্যোক্তার মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতঃপর অর্জিত মুনাফা পূর্ব-স্বীকৃত হার অনুসারে উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়। তবে ব্যবসায় লোকসান হলে পুঁজির যোগানদার তার দায়ভার গ্রহণ করবে। সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার তফাতটা এখানেই। কাজেই বেকারত্ব শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।[৫২]

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও আরো কতিপয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

ইসলামী শরীআহ বাস্তবায়ন

আমাদের দেশের বিদ্যমান আইন ব্যবস্থায় ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সব আইন-বিধান রয়েছে সেগুলো যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। অন্তত পক্ষে মীরাসী

আইন, শ্রমনীতি ইত্যাদি যেসব ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন রয়েছে সেগুলোর প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইসলামের অন্যান্য ইনসাফপূর্ণ আইনের সুযোগ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে। এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ হওয়ার পাশিপাশি যদি সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব পায় তবে তারা ইসলামী শরীআহ বাস্তবায়ন করে ইনসাফপূর্ণ বিধি ব্যবস্থা কায়েমে তৎপর হয়ে ওঠবে।

মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-কে জাতিসংঘ মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই পাঁচটি প্রয়োজন পূরণে কোন সরকারই সর্বাত্মকভাবে আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। এ সুযোগে ঈমান বিধ্বংসী এনজিওগুলো ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সময় থাকতে মৌলিক প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসা সম্ভব হলে আমাদের দেশের জনগণ ইসলাম বিদ্বেষী এনজিওদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারাত না। কাজেই জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।[৫৩]

পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল জনসমক্ষে তুলে ধরতে হলে প্রয়োজন হবে সফল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। এজন্য কতিপয় পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শুধু বাংলাদেশে নয় বরং সমগ্র বিশ্বেই সুদের বিরুদ্ধে কার্যকর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রমাণ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রায় তিন দশক পূর্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শরীআহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা করে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলতে পারে। শুধু চলতে পারে বললে যথেষ্ট হবে না, সাফল্যের বিচারে এই ব্যাংক সুদী ব্যাংকের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের স্বার্থক চ্যালেঞ্জ ও বটে।

সুতরাং পাইলট প্রজেক্টের সাফল্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণকে বিশেষ কর্মসূচি বা পদ্ধতি সাফল্য ও কৃতকার্যতা হাতে কলমে দেখানো যায়, অপরদিকে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকেও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা সহজ হয়।[৫৪]

উপসংহার

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনো কখনো তার উপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব ভুলে যায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী স. প্রদর্শিত পথনির্দেশনা অবলিলাক্রমে অমান্য করে চলে। ফলে সে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে

বহুবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রতিরোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যার অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানের নিমিত্তে বিশ্বব্যাপী মানব প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মহামন্দা চলছে উন্নত দেশগুলোও যেন তার প্রচণ্ড ধাক্কা কাটিয়ে ওঠতে পারছে না। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এমতাবস্থায় মানবজাতি যদি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত বিশ্ব মানবতার একমাত্র শান্তিদূত ও মহানবী স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের আদলে অর্থপ্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তাহলেই কেবল বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা কাটিয়ে ওঠতে সক্ষম হবে এবং স্বচ্ছ ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং বিশেষত বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক সম্যাবলী চিহ্নিত করে ইসলামের আলোকে সমাধান দেয়া সম্ভব হবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মহানবী স. প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার বিবরণ প্রদান করে সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মোটকথা, মহানবী স. প্রবর্তিত সম্পূর্ণ সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা যদি আমরা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি, তাহলে শুধু বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক মহামন্দাই কাটবে না বরং মুসলিম জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব পরিক্রমায় নেতৃত্বদানের সুযোগ লাভ করবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] আল কুরআন, ২:২৯

[২] আল কুরআন, ২:১৮৮

[৩] আল কুরআন, ২৮:৭০

[৪] আল কুরআন, ২:২০৫

[৫] আল কুরআন, ৩:১১০

[৬] আল কুরআন, ২২:৪১

[৭] আল কুরআন, ১৭: ২৬-২৭

[৮] আল কুরআন, ২৫:৬৭

[৯] নদভী,সাইয়েদ হাসান মুসান্না, *ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ১৪৫

[১০] আল কুরআন, ২:২৭৫

[১১] আল কুরআন, ৫১:১৯

[১২] আল কুরআন, ৩০:৩৮

[১৩] আলী, মাওলানা মুশাহিদ, বাংলা অনুবাদ: এ এস এম ওমর আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ১১৩

[১৪] নদভী, সাইয়েদ হাসান মুসান্না, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[১৫] ফরিদী, আ. ফ. ম. আবদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, খ.১৫, পৃ. ৫৯৫

[১৬] আলী, মাওলানা মুশাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[১৭] রহমান, মাওলানা হিফযুর, বাংলা অনুবাদঃ মওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ১৬১

[১৮] আলী, মাওলানা মুশাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[১৯] আবু দাউদ, ইমাম, *সুনান*, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, অধ্যায় : আল-খারাজ, অনুচ্ছেদ : ফী আরযাকিল উম্মাল, পৃ. ১৪৪৩, হাদীস নং ২৯৪৫

[২০] সাবজওয়ারী,এম এ, ইকনমিক এন্ড ফিসক্যাল সিস্টেম ডিউরিং দ্য লাইফ অব মুহাম্মদ স., *দ্য জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্স*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ২২

[২১] বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০ অধ্যায়ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-ইকতিদাউ বিসুনানি রাসূলিল্লাহ, পৃ. ৬০৬, হাদীস নং ৭২৮৫

[২২] আল কুরআন, ৯:১০৩

[২৩] রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর, *আল কুরআনে অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ৫৬২-৭৪

[২৪] ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল, *মহান রাষ্ট্রনায়ক রাসূলে কারীম স.*, মাসিক আল-বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ১১

[২৫] আল কুরআন, ৯:৬০

[২৬] ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[২৭] প্রাগুক্ত

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২৯] আল কুরআন, ৯:৬০

[৩০] আল কুরআন, ২:২৬৭

[৩১] সিদ্দিকী, ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার, বাংলা অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ভূইয়া, *রাসূল মুহাম্মদ স. -এর সরকার কাঠামো*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ২৭৯

[৩২] তাবারী, ইমাম, *তাফসীর তাবারী*, আল-কাহেরাঃ তাঃ বিঃ, খ.১ পৃ. ৪

[৩৩] রহমান, শেখ মুহাম্মদ লুৎফর, *ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩

[৩৪] বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ সাদাকাতুল ফিতর, অনুচ্ছেদঃ ফারদু সাদাকাতিল ফিতর, পৃ. ১১৯, হাদীস নং ১৫০৩

[৩৫] মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, অধ্যায়ঃ আল-ওয়াসিয়্যাতু, অনুচ্ছেদ : মা ইউলহাকুল ইনসানু মিনাস সাওয়াজিব বা'দা ওফাতিহি, পৃ. ৯৬৩০, হাদীস নং ৪২২৩

[৩৬] বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আশ-শুরুত, অনুচ্ছেদঃ আশ-শুরুতু ফিল ওয়াক্ফ, পৃ. ২১৯, হাদীস নং ২৭৩৭

[৩৭] নদভী, সাইয়েদ হাসান মুসান্না, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

[৩৮] আল কুরআন, ৮:৪১

[৩৯] মান্নান, ড. এম. এ. *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩, পৃ. ১৮৩

[৪০] আল কুরআন, ৫৯:৬

[৪১] আল কুরআন, ৫৯:৭

[৪২] আল কুরআন, ৯:২৯

[৪৩] আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৯

[৪৪] সিদ্দিকী, ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

[৪৫] তাবারী, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯০২

[৪৬] মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আত-তারগীব ফিত সাদাকাহ, পৃ. ৮৩৫, হাদীস নং ২৩০৫

[৪৭] সাবজওয়ারী, এম এ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৪৮] রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ. ১৬২-১৬৩

[৪৯] প্রাগুক্ত, ১৬৩-৪

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৭১-৮০

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ*

সারসংক্ষেপ

[ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের আসল লক্ষ হচ্ছে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার পরিমাণ কম হোক কিংবা বেশি হোক তা নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া। শুধু এক শ্রেণীর লোকের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ চলে যাক ইসলাম তা অনুমোদন করে না। এজন্য ইসলাম উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সম্পদ বন্টনের একটি সুন্দর ও সুষম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের গুটি কয়েক লোকের হাতে সমস্ত সম্পদ চলে যাবার আশংকা থাকে না। বরং সকলের আর্থিক নিরাপত্তা বজায় থাকে। দুনিয়ার অন্যান্য অর্থব্যবস্থার সুফল হচ্ছে সম্পদ এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর ইসলামের সুফল হচ্ছে তা বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তার আবর্তন সহজতর করা। এজন্য ইসলামে কারো উত্তরাধিকারী না থাকলে বা না পাওয়া গেলে তার সম্পদ মুসলিম রাষ্ট্রের বায়তুলমালে দাখিল করতে হবে যেন তা দ্বারা সমগ্র জাতি উপকৃত হতে পারে। উত্তরাধিকারী না থাকলে পালক সন্তান রেখে সম্পদ এককেন্দ্রিক করে রাখার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। অত্র প্রবন্ধে মীরাস বা উত্তরাধিকারের পরিচয় ও গুরুত্ব, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ক্রমোন্নতি এবং একটি পর্যালোচনা স্থান পাবে।]

মীরাস বা উত্তরাধিকারের পরিচয় ও গুরুত্ব

আরবী অভিধান 'আল-মুনজিদ' অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ওয়ারিস হয়েছে অর্থ : কারো মৃত্যুর পর তার সম্পদ কারো কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর মীরাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মীরাস হল মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি।[১] 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার ঐ সমস্ত ধন-সম্পদকেই বলা হয়, যেগুলো কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ইসলামী আইন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "নিজের উত্তরাধিকারীকে মালদার অবস্থায় রেখে যাওয়া ভাল এমন অবস্থার চেয়ে যে, তুমি তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাও এবং তারা লোকের কাছে হাত পাততে থাকে।"[২]

যেহেতু উত্তরাধিকার আইন মৃত-জীবিত উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, তাই এগুলো অধ্যয়ন করার উপর রসূলুল্লাহ্ স. অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন: "হে আবূ হুরায়রা! উত্তরাধিকার আইন তোমরা নিজেরাও শিখ এবং অন্যকেও শিখাও, কেননা তা বিদ্যার অর্ধেক"।[৩] তিনি আরো বলেছেন: "তিন ধরনের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এ ছাড়া বাকী জ্ঞান অতিরিক্ত। সে তিন ধরনের জ্ঞান হলো : কুরআন, সুন্নাহ ও ফারায়িয।"[৪] ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টিত না হওয়ার দরুন সমাজের মধ্যে অসাম্যের সৃষ্টি হয়। প্রফেসর টাসিগ বলেছেন, "উত্তরাধিকারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কেবলমাত্র এ জিনিসটিই বিত্তহীন এবং বিত্তশালীদের মধ্যকার বৈষম্যকে আরো প্রশস্ত করে তোলে।"[৫] কোন ব্যক্তি স্বীয় জীবনে বহু সম্পদ সঞ্চয় করে গেলেও তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি,আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতি সৃষ্টির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এহেন সুন্দর ব্যবস্থা কেবল অসংখ্য মানুষের রক্ত শোষণকারী পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতেই নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু মানবিক সমানাধিকারের দৃষ্টিতে তা শুধু প্রশংসনীয়ই নয় বরং পরম কাম্যও বটে।[৬]

ইসলামী বিশ্বকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে অর্থনৈতিক দিকগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, যেগুলো সম্পর্কে ভন্ ক্রেমার বলেছেন, "এগুলো হচ্ছে ইসলামী নীতিশাস্ত্রের সবচেয়ে অতুলনীয় সম্পদ।"[৭] মিঃ র‍্যামসে বলেন, "সভ্য জগত উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে এ যাবত যা কিছু জানতে পেরেছে, তার মধ্যে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যুক্তিসংগত এবং পূর্ণাঙ্গ।"[৮]

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ক্রমোন্নতি

জাহেলী যুগের আরব অধিবাসীরা তাদের মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতো। আর তাদের স্ত্রীরা উত্তরাধিকার পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো নিজেরাই কোন না কোন উত্তরাধিকারীর 'মীরাসে' পরিণত হতো। ঠিক এভাবে মৃত ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেও পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্ররাই হত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী এবং তাদের অবর্তমানে মৃতের অন্য কোন আত্মীয় যেমন বাপ কিংবা ভাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো। কেননা তখনকার যুগে শুধু সে সমস্ত লোকই উত্তরাধিকারী হতে পারত যাদের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত যোগ্যতা ছিল।[৯] অতএব শুধু মৃতের বংশধররাই যে তার উত্তরাধিকারী হবে তেমন কোন নিয়ম ছিল না।

ইসলাম শান্তি ও সাম্যের ধর্ম, তাই উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমরযোগ্যতার কোন গুরুত্ব নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে, শুধু মৃতের বংশধর এবং নিকটাত্মীয়রাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে, অন্য কেউ নয়। মৃতের সন্তান-সন্ততি ছোট হোক, বড় হোক, নারী হোক অথবা পুরুষ, তাতে কিছু যায় আসে না। তারা তাদের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

জাহেলী যুগে এ নিয়মও প্রচলিত ছিল যে, কেউ নিঃসন্তান হলে তার পালক পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যেত। ইসলামী আইন অনুযায়ী, পালক পুত্র তার পালক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। কেননা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে পালক পুত্রের চেয়ে নিজের বংশের লোকেরাই অধিক যোগ্য। কুরআন বলে : "পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"[১০]

উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক. মীরাস কেবল পুরুষদের নয় নারীদেরও অধিকার। দুই. যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যই বণ্টিত হতে হবে। এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি একগজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে তাহলে তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিন. এ আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কান ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। চার. এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। পাঁচ. এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস পায় না।[১১]

যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করেন তখন রসূলুল্লাহ স. আনসার এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এর ফলে মুহাজিরগণ তাদের আনসারী ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো।[১২] অপর দিকে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হিজরত না করলে স্বাভাবিকভাবেই তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এ আইনের লক্ষ খুব সম্ভব এ ছিল যে, সমস্ত মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসুক। কুরআন বলেঃ "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে

সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[১৩]

অতঃপর উত্তরাধিকার আইনকে ব্যাপকতর করা হলো। বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করার বিধান নিম্নলিখিত আয়াতের ভিত্তিতে জারি করা হলো। "তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল, তা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।"[১৪] ইসলাম মানুষকে ওসিয়ত করার স্বাধীনতা দিয়েছে সত্য, তবে এ ওসিয়তের পরিমাণ মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। কারণ এর চেয়ে বেশি হলে আত্মীয়-স্বজনরা বঞ্চিত হবে। সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের বছর আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার রোগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ফলে আমার এ অবস্থা। আমার সম্পদ অনেক কিন্তু একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আমার অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করব? তিনি বললেন : না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন : না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এক তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।"[১৫] আবার যারা আইনগতভাবে সম্পদের উত্তরাধিকারী তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ওসিয়ত কার্যকর হবে না। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন সুতরাং উত্তরাধিকারীর জন্য কোন ওসিয়ত করা যাবে না।"[১৬]

ওসিয়তের অধিকার দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা হয়েছে। কোন সম্পদশালী মুসলিম যদি জানে যে, তার একজন নিকটাত্মীয় (যেমন মৃত ছেলের ঘরের নাতি-নাতনি) সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাহলে সে ওসিয়তের মাধ্যমে তাকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করে যেতে পারে।

বদর, উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে, ওসিয়ত করে যেতে পারেন নি এমন বহু সাহাবী শহীদ হন। ফলে তাদের সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে সে প্রশ্ন দেখা দেয়। আউস ইবনে সাবিতের বিধবা স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ স.-এর খিদমতে নিবেদন করেন যে, তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অথচ তিনি এবং তার ছোট ছোট মেয়েরা আউসের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কিছুই পান নি। কেননা, পুরো সম্পত্তিটাই পুরুষ উত্তরাধিকারীরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়ে গেছে।[১৭]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে দেখার জন্য এলেন। আমি চেতনাহীন ছিলাম। রসূলুল্লাহ স. ওযু করেন এবং ওযু করার পর পাত্রে যে পানি ছিল তা আমার উপর ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার চেতনা ফিরে আসে। আমি রসূলুল্লাহ স.

এর কাছে নিবেদন করি, "হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার সম্পত্তি কি করব? আমার তো কয়েকজন বোন আছে? রসূলুল্লাহ্ স. কোন উত্তর দিলেন না, এমন সময় উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।[১৮] "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন : একজন পুরুষের অংশ দু' জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি নারীই হয় দু'য়ের অধিক, তবে তাদের জন্য ঐ সম্পদ তিন ভাগের দু'ভাগ যা মৃত ব্যক্তি ত্যাগ করে মারা যায় এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের একভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের একভাগ, ওসিয়তের পর যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির যা তারা ছেড়ে যায়; ওসিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এ মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশে অংশিদার হবে ওসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১৯] অতঃপর উত্তরাধিকার আইন আরো ব্যাপকতা লাভ করল এবং তাতে প্রতিটি লোকের অংশই নির্ধারিত হয়ে গেল।

মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে জাবির রা. থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জাবির রা. বলেন : সা'দ ইবনে রবী' রা.-এর স্ত্রী তার দু'টি সন্তান নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে বললেন : "হে আল্লাহর রসূল! এরা সা'দের মেয়ে। এদের বাবা আপনার সাথে ওহুদের যুদ্ধে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছেন। এদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে। এদের জন্য কোন কিছু রাখেনি। সম্পদ ছাড়া তো এদের বিয়ে দেয়া যাবে না অর্থাৎ সহায়-সম্পত্তিহীন এ মেয়েদেরকে কেউ বিয়ে করবে না। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন : আল্লাহ্ এ ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

তখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। মীরাসের আয়াত নাযিল হলে রসূল স. মেয়েদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন : সা'দের মেয়েদের তাঁর সম্পদের তিনভাগের দু'ভাগ দিয়ে দাও এবং তাদের মাকে আট ভাগের একভাগ দাও। আর বাকী অংশ তোমার।"[২০]

যখন এ মর্মে ওহী নাযিল হয় যে, ছোট ছোট ছেলে এবং স্ত্রীলোকেরা এবং পিতা-মাতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তখন মুসলমানদের কেউ কেউ এটাকে অপসন্দ করে। তারা বলতে থাকে, "আমরা কি আমাদের স্ত্রীদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক অথবা আট ভাগের এক অংশ এবং মেয়েদেরকে দু' ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেব, এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেব অথচ এদের কেউই যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে না? এদেরকে মালে গনীমত দেয়াও তো বৈধ নয়। যা হোক, এখন এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উচিত। খুব সম্ভব রসূলুল্লাহ্ স. বিষয়টি ভুলে গেছেন। আর যদি ভুলে না থাকেন তাহলে আমরা তাঁকে এ আইনটি পরিবর্তন করার জন্য বলব। কিছু লোক শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ স.-কে বলেই ফেলল, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি মৃত ব্যক্তির মেয়েকেও তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দেব অথচ সে ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে না এবং শত্রুর সাথে লড়তেও জানে না? আমরা কি ছোট ছেলেকেও সম্পত্তির অধিকারী করে নেব অথচ সে কোন কিছুই করতে পারে না।[২১]

পর্যালোচনা

মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে যে বিষয়টি আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও সমালোচিত সে বিষয়টি আমি এখানে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব। মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষের অংশ হবে নারীদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবনে শরীয়ত পুরুষদের উপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা বেশি দিয়েছে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে নারীদের মুক্তি দিয়েছে। যেমন বিবাহের সময় ছেলেকে মহরানা দিতে হয় যা তার জন্য ফরয। আর মেয়ে এই মহরানা লাভ করে। বোনদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করা এবং তাতে খরচ করা শরীয়ত ভাইয়ের দায়িত্বে রেখেছে। এ ব্যাপারে বোনের কোন দায়িত্ব নেই। বাবা-মায়ের দিকের আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর বাড়ির দিকের আত্মীয়-স্বজন সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করা পুরুষের দায়িত্ব, নারীর দায়িত্ব নয় ইত্যাদি। এ সব কারণে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় কম রাখা হয়েছে এবং এটিই ইনসাফের দাবি। এ প্রসংগে ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য করেছেন, তিনি নারীর জন্য পুরুষের অর্ধেক অংশ নির্ধারণ করেছেন। তা এজন্য যে, পুরুষকে খরচের ভার বহন করতে হয়, বিভিন্ন দায়িত্ব

নিতে হয়,ব্যবসা, উপার্জনে তাকেই সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। এসব কারণে তাকে নারীর দ্বিগুণ দেয়াই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।[২২]
মীরাসের বিধান বর্ণনার শেষে আল্লাহ বলেছেন, "এটি আল্লাহর নির্দেশ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।" এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যারা আল্লাহ প্রদত্ত মীরাসী আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর আইনের ত্রুটি দূর করতে চায়। আল্লাহর জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করার পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে। এক. যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দুই. আল্লাহ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ ভাল জানেন।[২৩]
মীরাসের বিধান যে দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তার পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ বলছেন : "এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[২৪] এর মাধ্যমে আল্লাহ বলেছেন যে, যারা মীরাসী আইন পরিবর্তন করে বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে এভাবে যে, যারা স্থায়ীভাবে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে বা যারা কেবল বড় ছেলেকে মীরাসের হকদার গণ্য করে বা কুরআন নির্ধারিত মীরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরি পরিহার করে 'যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি' হিসেবে একে ব্যবহার করে বা ছেলে ও মেয়েরে অংশ সমান করে তারা সবাই সীমালংঘনকারী এবং এদের সবার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে ধন-সম্পদ বন্টনের যে পদ্ধতি রয়েছে তা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও সুবিন্যস্ত। এ পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হলে এবং সমাজে এর প্রচলন ব্যাপক হলে পুঁজিবাদসুলভ সম্পদ কেন্দ্রিভূত হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে সমাজে একদিকে জমিদারী জায়গীরদারী প্রথার বিলোপ ঘটবে, অন্যদিকে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও বৃদ্ধি পাবে না। কেননা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ উপকরণ সব সময় আবর্তনশীল থাকে। এক হাত থেকে বেরিয়ে অপর হাতে পৌঁছার দরুন তার দ্বারা কম-বেশি সবাই উপকৃত হতে থাকে।
শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দিহ্লবী র. তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর 'আল্-ফারায়িয' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি এ সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য।[২৫]

উপসংহার

যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি হল, নিজ পরিবার ও গোত্রের মধ্যে মানুষকে অবশ্যই একে অপরের সাহায্য করতে হবে, সমবেদনা ও কল্যাণকামিতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যের লাভ-লোকসানকে নিজের লাভ-লোকসান মনে করতে হবে। আর এটা এমন সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়, যার পিছনে তাকে সুদৃঢ় করার জন্য থাকবে বাইরের উপকরণ এবং নিরাপদ রাখার জন্য থাকবে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসা রীতি-নীতি। এ ক্ষেত্রে 'জিবিল্লাত' বলতে বোঝানো হয়েছে, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এবং অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে। আসবাবে খারিজী বা বাইরের উপকরণ দ্বারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, সমবেদনা প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব বিষয় একের বিপদ-আপদে অপরকে এগিয়ে যেতে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য শরীয়ত যে সব বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছে এবং না করার জন্য নিন্দা করেছে, সেগুলোকে সুন্নাত বলা হয়। যেমন শরীয়ত নির্দেশ দিচ্ছে সমবেদনা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। যারা তা করবে না, তারা পাপী। এরূপ বাধ্যতামূলক করার কারণ হল, অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন মানুষ মন্দ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সমবেদনার মত উত্তম কাজগুলো করে না। অথচ তারা অনেক অপ্রয়োজনীয় ও খারাপ কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এরূপ অবস্থায় এ জাতীয় ভাল (চারিত্রিক) বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন পীড়িতকে দেখতে যাওয়া, বিপদগ্রস্ত (ঋণগ্রস্ত, বন্দী প্রভৃতি) লোককে মুক্ত করা, দিয়াত (আত্মীয়দের উপর ধার্যকৃত) বা শোণিতপাতের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা, নিজের রক্ত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ দাসকে মুক্ত করা প্রভৃতি বিষয়। আর মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় এবং ধন সম্পদের আশা ছেড়ে দেয় কেবল তখনই এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার সব চাইতে বেশি উপযুক্ত সময়। কেননা এ সময় তার জন্য প্রয়োজন হয় নিজের ধন-সম্পদ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাজে অধিক পরিমাণে ব্যয় করা নতুবা তা মৃত্যুর পর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রেখে যাওয়া এরূপে যে, তা তাদের সাহায্য-সহায়তা করবে। যাই হোক, ধন-সম্পদ বণ্টনের জন্য এটা (উত্তরাধিকার আইন) একটা উত্তম পদ্ধতি। কাজেই ইসলাম স্বীকৃত উত্তরাধিকার আইন মেনে নেয়া হলে হকদার তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে, অপরদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে এটি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. *আল-মুনজিদ,* আল-মাতবা আশ-শারকিয়া, লেবানন : ২০০০, পৃ.৮৯৫

[২]. ইবনে মাজা, ইমাম, *সুনান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, অধ্যায় : আল ওসায়া, অনুচ্ছেদ : নং-৫, হাদীস নং-২৭০৮

ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

[৩]. *ইবনে মাজা*, ইমাম, *সুনান*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আল ফারা'ইয, অনুচ্ছেদ : নং-১, হাদীস নং-২৭১৯
يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم

[৪]. ইবনে কাছীর, ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, মিসর: দারুত তাকওয়া লিত-তুরাছি, তা. বি.পৃ.৫৩০
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل:أية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

[৫]. টাসিগ, *প্রিন্সিপলস অব ইকনমিক্স* তা. বি. খ. ২, পৃ. ২৪৬

[৬]. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আবু ছাইদ, *ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ.৯

[৭]. ইউসূফুদ্দীন, ডক্টর মুহাম্মদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু: আবদুল মতিন জালালাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ২০৭

[৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

[৯]. ইবনে কাছীর, ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩১

[১০]. আল কুরআন, ৪:৭
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا-

[১১]. আবুল আ'লা সাইয়েদ, *তাফহীমুল কুরআন*, (অনু: আবদুল মান্নান তালিব), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪, খ.২,পৃ.১০৪

[১২]. বুখারী, ইমাম, আস-*সহীহ*, অধ্যায়: কিফালা, অনুচ্ছেদ : নং-২
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارى

[১৩]. আল কুরআন, ৮:৭২
ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله والذين ءاووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين ءامنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيئ حتى يهاجروا وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير-

[১৪]. আল কুরআন, ২: ১৮০
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين-

[১৫]. বুখারী, ইমাম, *আস সহীহ*, অধ্যায়: আল ওসায়া, অনুচ্ছেদ : নং-২

[১৬]. ইবনে কাছীর, ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.৫৩৫
إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

[১৭]. ইবনে সা'দ, পৃ. ২৮২

[১৮]. আবু দাউদ, ইমাম, *সুনান*, অধ্যায়: আল-ফারা'ইয, অনুচ্ছেদ: নং-১, হাদীস নং-২৮৮৬
مرضت فأتانى النبى صلى الله عليه وسلم يعودنى هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمى على فلم أكلمه فتوضأ وصبه على فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فى مالى ولى أخوات ؟ قال فنزلت أية الميراث -

[১৯]. আল কুরআন, ৪:১১-১২

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له إخواة فالامه السدس من بعد وصية يوصى بها اودين ءاباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما—ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم

[২০]. *ইবনে কাছীর,* ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, খ.১,পৃ.৫৩০-৩১

عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله هاتلن ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما فى يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال فقال يقضى الله فى ذلك فنزلت اية الميراث فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك -

[২১]. *ইবনে কাছীর,* ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, খ. ১, পৃ. ৫৩১

لما أنزلت الفرئض التى فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يجوز الغنيمة اسكتوا عن هذل الحديث لعل رسول الله ينساه أو نقول له فيغير فقال بعضهم يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقلتل القوم ويعطى الصبى الميراث وليس يغنى شيئا وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر-

[২২]. *ইবনে কাছীর,* ইমাদুদ্দীন ইসমাইল, খ.১,পৃ.৫৩১

فاوت الله بين صنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لإحتياج الرجل إلى منونة النفقة والكلفة ومعانة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذه الأنثى -

[২৩]. *তাফহীমুল কুরআন,* প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১০৭

[২৪]. আল কুরআন, ৪ : ১৩-১৪

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم- ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نلرا خالدا فيها وله عذاب مهين-

[২৫]. দিহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,* খ. ১, তা. বি. পৃ. ১১৭

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৮১-৯৪

শরীআহ্ আইনের উৎস ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা

মোঃ মাসুদ আলম*
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান**

সারসংক্ষেপ

[মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যেখানে মানব জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে। ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নীতি, বিচারব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা আছে এতে। বিচারব্যবস্থা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার স্বাধীনতার উপরে একটি দেশের সুশাসন এবং জাতির কল্যাণ নিহিত। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি শরীআহ বিচার ব্যবস্থা তারই নমুনা। কোন রাষ্ট্রে ও সমাজে শরীআহ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সে রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শরীআহ্ বিচারব্যবস্থা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য এক বিরাট নি'আমত। তাই শরীআহ্ বিচারব্যবস্থা প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণের লক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শরীআহ্ আইন এর উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

আইনের পরিচয়

আইনের একটি সর্বজন গৃহীত সংগা দেওয়া কঠিন। এর সংগা এত ব্যাপক যে, শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ দ্বারা একে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবুও আইনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষকে বোঝার জন্য আইন শাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংগা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

বাংলা ভাষায় আইন শব্দটিকে বুঝতে ইংরেজীতে দু'টি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়– Law এবং Act. আইনের মূলে যে সূত্র আছে তাকে Law বলা হয়। যেমন,

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** এম. ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Laws on Evidence, Laws on Contract. আর Act বলতে একটি বিশেষ আইন বা একটি সুনির্দিষ্ট আইন বুঝায়। যেমন Evidence Act, Contract Act. সংসদ যে আইন পাস করে তাকে Act বলে। বাংলা ভাষায় Law এবং Act, এই দু'ট শব্দের জন্যই আইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ, অংশীদারী আইন ও পণ্য বিক্রয় আইন-এ Act এর স্থলে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

উল্লেখ্য যে, আইন শব্দটি কেবল আইনজীবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কোন শব্দ নয়, এটি জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণের আইনের কথা বলেন, ধর্ম তাত্ত্বিকগণ ওহীভিত্তিক আইনের কথা বলেন। আবার কখনো সম্মান প্রদর্শন আইন, বিভিন্ন খেলার আইনের কথা শোনা যায়,যদিও এ আইনগুলো আদালতের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়।[২]

আইন (ائين) শব্দটি ফারসী শব্দ। আব্বাসীয় যুগে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটি নিয়ম, প্রথা, কানুন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতো। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইবনুল মুকাফ্ফা কর্তৃক সংকলিত পাহলবী হতে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকায় 'আইননামাহ্' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নামের অনুবাদ অনেক সময় আরবীতে 'কিতাবুর-রুসূম' করা হয়েছে। এতে সম্ভবত সাসানী (প্রাচীন পারস্যের একটি রাজবংশ) শাসনব্যবস্থা ছাড়াও উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অধিকারের উল্লেখ ছিল। দরবারী জীবন ও দরবারী আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির সবিস্তার বর্ণনাও এতে ছিল।[৩]

পরবর্তীকালে ফারসী ভাষায় রচিত অন্যান্য গ্রন্থও 'আইন' নামে অভিহিত হয়েছিল। এ সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী নিয়ম-কানুন ও প্রথা। যেমন, আবুল ফযল কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আকবর নামাহ'র ঐ অংশের নাম 'আঈন-ই-আকবারী'-যাতে আকবরের দরবারের আদব ও রীতি-নীতির বর্ণনা আছে।[৪] এ ছাড়াও বিশ্ববরেণ্য আইনবিদগণের দেওয়া 'আইন'-এর একাধিক সংগা পাওয়া যায়। যেমন–

বিশিষ্ট আইনবিদ জাস্টিনিয়ান বলেন : Law is the king of all mortal and immortal affairs, which ought to be the chief, the ruler and the leader of the noble and the base and thus the standard of what is just and unjust, the commander to animals naturally social of what they should do, the forbidder of what they should not do.[৫]

Blackstone বলেন : Law is its most general and comprehensive sense signifies a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of

actions, whether animate or inanimate, rational or irrational.Thus we say the law of gravitation or optics of mechanics, as well as the laws of nature and of nations. [৬]

Justice Holmes বলেন : Law is a statement of the circumstances in which the public force will be brought to bear upon men through courts. [৭]

Bentham বলেন : Law or the law, taken indefinitely, is an abstract or collective term, which when it means anything, can mean neither more or less than the sum total of a number of individual laws taken together. [৮]

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান বলেন, "আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয় সেই কালের ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা। আইন বলতে মোটামুটিভাবে যে সময়ে প্রণীত হয় সেই সময়ে যাকে শৃঙ্খলা জ্ঞান করা হয়, সেই শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে গৃহীত আদেশ-নিষেধ প্রভৃতিকে বুঝায়। মানুষ স্বভাবতই শৃঙ্খলাকামী। এই শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই মানুষ নীতি নির্ধারণ করে। আর সেই আলোকেই আইনের সৃষ্টি হয়।"[৯]

শরীআহ্ আইন

মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগই কোন না কোন পর্যায়ে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই সাধারণ ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে যেমন জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ জরুরী শরীআহ্ আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। নিম্নে শরীআহ্ আইনের সংগা প্রদান করা হলো–

(ক) ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীআহ'তে যেসব নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে তাই শরীআহ্ আইন।[১০]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-কে নির্দেশমূলক বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যা অবহিত করেছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না।"[১১]

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন : "বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর কামনা করছ তা আমার নিকট নেই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।[১২] (খ)আরবী ফিক্হ শব্দের প্রায়োগিক অর্থ

আইন। কাজেই শরীআহ আইন হচ্ছে মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।[১৩]
(গ) শরীআহ আইনের সংগা প্রদান করতে গিয়ে মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেন, যে আইন মানুষের পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে তাই শরীআহ আইন।[১৪]

শরীআহ আইনের গুরুত্ব

শরীআহ আইন হল মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার বিকাশে শরীআহ আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এই শরীআহ আইন মানবজাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। শরীআহ আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত"।[১৫]
অত্র আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য শরীআহ আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করার সুযোগ নেই।
মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ "যারা আল্লাহ্র বিধানমত ফয়সালা না করে তারা কাফির"(অবিশ্বাসী)।[১৬]
"যারা আল্লাহ্র বিধানমত ফয়সালা না করে তারা যালিম (অত্যাচারী)"।[১৭]
"যারা আল্লাহ্র বিধানমত ফয়সালা করে না তারা ফাসিক" (পাপিষ্ট)[১৮] বলে আখ্যায়িত হবে। আল্লাহ আরো বলেন– "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর"।[১৯]

শরীআহ আইনের উৎস

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর সময়ে তাঁর প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থায় শরীআহ আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে, (১) মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং (২) আল-হাদীস।

আল কুরআন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর সময়ে প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থার প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। যে সমস্ত বিধান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হতো মহানবী স. তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতেন। তাঁর ফয়সালা সাধারণত আল-কুরআনের নির্দেশ দ্বারা সম্পন্ন হতো। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্টও ছিলেন। আল্লাহ

তাআলা বলেন, "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর; এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করো না"।[২০]

মহানবী স.-এর সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে কিংবা কোন ঘটনা সংঘটিত হলে তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর অপেক্ষায় থাকতেন এবং ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি তা বাস্তবায়ন শুরু করতেন। আল্-কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তাঁর দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, উহা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন"।[২১]

আল-হাদীস

ইসলামে আল্-কুরআনের পরেই আল-হাদীস শরীআহ্ আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। আল্-কুরআনের কোন বিধি-বিধান সংক্ষিপ্ত হলে মহানবী স. তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। আল্-কুরআনে কোন প্রসঙ্গে বিধি-বিধান না পাওয়া গেলে মহানবী স. ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকতেন। কারণ তিনি শরীয়তের ব্যাপারে নিজে কিছু বলতেন না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আছে, "সে মনগড়া কথাও বলে না; ইহা তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।[২২]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। সে বিধি-বিধানসমূহ ও এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। এর অধিকাংশ মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণ কর্তৃক মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। সে বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার জন্য মুসলমানগণকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর"।[২৩]

অপর এক আয়াতে সকল ব্যাপারে মহানবী স. কে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, "বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[২৪]

এছাড়া মহানবী স. স্বয়ং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন। যেমন তিনি বলেছেন, "আমাকে যেরূপ নামায পড়তে দেখছো, তোমরাও ঠিক সেভাবে নামায পড়বে"।[২৫]

মহানবী স. আরও বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন গ্রহণ করো"।[২৬]

এভাবে মহানবী স. নিজের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে অসংখ্য বিধি-নিষেধ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কার্যকর করেছিলেন। কিছু কিছু কাজ এমন ছিল যা শুধু তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, উম্মতের জন্য নয়। যেমন, সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা), একত্রে চার-এর অধিক বিবাহ এবং বিনা দেনমোহরে বিবাহ করার বিষয়। আল্লাহ্ বলেন, "এ বিধান বিশেষ করে তোমারই জন্য"।[২৭]

আল্লাহ্র কিতাব আল কুরআন এবং রাসুল স.-এর আল-হাদীস, এ দু'টির মধ্যে প্রথমোক্ত উৎসে কোন বিষয়ের সমাধান না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় উৎসে তা অনুসন্ধান করতে হবে। এ উৎসেও যদি কোন সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরবর্তীকালে আল-ইজমা, আল-কিয়াস, আল-ইসতিহ্সান, মাসালিহ মুরসালাহ, উরফ (প্রথা), ইজতিহাদ, ইসতিদলাল প্রভৃতি শরীআহ আইনের মর্যাদা লাভ করে। নিম্নে উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

আল-ইজমা

শরীআহ আইনের তৃতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে ইজমা। এর সংগা নিরূপণে ফকীহগণের একাধিক অভিমত বিদ্যমান। ইজমা শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য হওয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায়– "একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল সৎ কর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বাচনিক ও কর্মসূচক ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে আল্ ইজমা বলে।[২৮] কুরআন মাজীদ ও হাদীস দ্বারা ইজমার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী"।[২৯]

অপর এক আয়াতে আছে, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা কর"।[৩০]

নবী স. বলেছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। যখন তোমরা উম্মতের মাঝে মতপার্থক্য দেখতে পাবে, তখন বড় জামাআতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"[৩১]

আল-কিয়াস

কিয়াস ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং শরীআহ আইনের ব্যাপকতর ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পরে কিয়াস হলো ইসলামী ফিক্হের অন্যতম একটি উৎস। কিয়াস শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ– অনুমান করা,

যুক্ত করা, শুরু হওয়া ইত্যাদি। উসূলে ফিক্হের পরিভাষায় হুকুমকে মূল থেকে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলা হয়। যেমন উদ্ভূত কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার মধ্যে পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শরীয়তে সরাসরি বিদ্যমান নেই, কিন্তু উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় বিদ্যামান রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর উক্ত কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয়সমূহের মধ্যেও পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৪০]
বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ্ র. বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের নস সুস্পষ্ট বিদ্যমান নেই সেই বিষয়টি কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে মিলানো, যার সম্পর্কে শরীয়তের নস ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে তাকে কিয়াস বলে।[৩৩]
মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ নিম্নোক্ত সংগা প্রদান করেছেন এভাবে, কারণসমূহ বিবেচনাপূর্বক নির্গত বিধানকে মূল বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে কিয়াস বলে।[৩৪]

আল-ইসতিহ্সান

ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমাদ ইবনে হাম্বল র. কোন বিধান প্রণয়নের জন্য ইসতিহ্সানকে শরীয়তের দলীল মনে করেন। ইমাম মালিক র. হতে বর্ণিত আছে, "ইসতিহ্সান জ্ঞানের উনিশ ভাগের এক ভাগ"।[৩৫] ইসতিহ্সান শব্দের আভিধানিক অর্থ– কোন কাজ বা বিষয়কে কল্যাণকর মনে করা। ফকীহগণের পরিভাষায়, যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে আর হাদীস বা ইজমা অথবা গোপন কিয়াস এ কথার বিপরীত কামনা করে এমতাবস্থায় কিয়াস ত্যাগ করে বিপরীত হুকুমের উপর আমল করাকে ইসতিহ্সান বলে।[৩৬]
ইসতিহ্সানের সমর্থনে বা এর প্রতি ইঙ্গিতবাহী নির্দেশ কুরআন মাজীদে বিদ্যমান আছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধ শক্তিসম্পন্ন।"[৩৭]
অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এবং তোমার সম্প্রাদায়কে যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও।"[৩৮]

মাসালিহ মুরসালা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, মুজতাহিদ যে কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করেন এবং শরীয়তে উক্ত কাজের বিপরীত কোন নির্দেশ বিদ্যমান নেই তাকে মাসালিহ মুরসালা বলে।[৩৯]

ইমাম আল-গাযালী র.-এর মতে, "বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তই হলো মাসালিহ্ মুরসালার ভিত্তি এবং তা প্রমাণের জন্য কোন সর্বসম্মত মূলনীতি বিদ্যমান নেই।"[৪০]

আল-ইজতিহাদ

ইজতিহাদ-এর অর্থ– অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, প্রয়াস, কঠোর শ্রম ইত্যাদি।কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না পাওয়া গেলে সে বিষয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের জন্য মুজতাহিদ ফকীহ্ যখন তার সর্বশক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলে।[৪১] এই ইজতিহাদ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস।

আল-ইসতিদলাল

ইসতিদলাল এর অর্থ– দলিল বা যুক্তি অনুসন্ধান করা।[৪২] কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফীগণ ইসতিদলাল শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। শাফেঈ ও মালেকীগণের মতে ইসতিদলাল বলতে যা বোঝায় তা কুরআন এর ব্যাখ্যা বা কিয়াসের আওতায় আসে না। একে যুক্তির মাধ্যমে নির্মিত সিদ্ধান্ত বলা যায়। ইসতিদলাল তিন পর্যায়ে হতে পারে।
(১) একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের যোগ ঘটলে এবং তার পিছনে কোন কার্যকর কারণ বিদ্যমান না থাকলে সেই যোগের প্রকাশকে এক ধরনের ইসতিদলাল বলা হয়।
(২) কোন বস্তু বা তার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিলোপ বা স্থগিত না করা যায় ততক্ষণ ধরে নিতে হবে যে উক্ত বস্তু বা তার অবস্থা বহাল আছে।
(৩) ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যে আইন প্রত্যাদিষ্ট তা প্রামাণ্য।[৪৩]

শরীআহ্ আইন-এর বৈশিষ্ট্য

শরীআহ্ আইন আল্লাহ্ প্রদত্ত। এ আইন মানব রচিত আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনে মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে । পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করা দূরে থাক, সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। শরীআহ্ আইনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল–

(ক) শরীআহ্ আইন আল্লাহ্ প্রদত্ত

আল্লাহ্ তাআলা প্রথম মানব আদম আ. ও হাওয়া আ. কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় বলেন, "পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৪৪]

একথা সত্য যে, আদম আ. থেকে মহানবী স. পর্যন্ত সকল নবী-রসূলকে যুগোপযোগী আইন কাঠামো দিয়ে আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা তা কার্যকর করেন।

(খ) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

শরীআহ আইনে আল্লাহ তাআলা হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাকে সার্বভৌমত্ব বলা হয় তার নিরঙ্কুশ মালিক হলেন আল্লাহ। মানুষ তার খলীফা হিসেবে কেবল ঐ ক্ষমতার বাস্তবায়ন করে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে কেবল তাঁর ব্যতীত।[৪৬]

অপর এক আয়াতে আছে, "বস্তুতঃ সমুচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্ব।[৪৭]

অতএব ইসলামী সংবিধানের প্রথম কথা হল, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়নকারী মাত্র।

(গ) শরীআহ্ আইন অবিভাজ্য

শরীআহ আইনমানব জীবনের যাবতীয় আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করেছে। এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক, ইবাদত বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচরণ, আকীদা, বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয় শরীআহ আইনের আওতাভুক্ত। এছাড়াও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান শরীআহ আইনের অর্ন্তভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনের হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে"।[৫৮]

(ঘ) শরীআহ্ আইন সর্বজনীন

শরীআহ আইন কাঠামো বিশ্বের যে কোন দেশের, যে কোন পরিবেশের, যে কোন অবস্থার এবং যে কোন স্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের জন্য শরীআহ আইনের অনুসরণ করা সম্ভব। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক মহানবী স.-কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "বল, হে, মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী"।[৪৯]

মহানবী স. বলেন, "আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি"।[৫০]

অপর এক হাদীসে আছে, "আমি সাদা কালো সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি"।[৫১] অতএব তিনি যেমন সৃষ্টিকুলের নিকট প্রেরিত হয়েছেন তদ্রূপ তাঁর আনীত বিধানও সর্বজনীন।

(ঙ) শরীআহ্ আইন পূর্ণাঙ্গ

মানব জীবনের সার্বিক দিক পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন বা শরীআহ্ আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। আদম আ. থেকে শুরু করে মানব জাতির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে বিয়োজন অনুসারে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মহানবী স. এর যুগ তথা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক এতে পূর্ণাঙ্গতা ও চিরন্তনতা দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"।[৫২]

আল্লাহ্ আরও বলেন, "তিনি তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন অপর সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করবার জন্য"।[৫৩]

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা শেষনবী মুহাম্মাদ স. এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দান করেছেন।

(চ) শরীআহ্ আইন অপরিবর্তনীয়

শরীআহ আইনের যে অংশ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে সেগুলো অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। কোন অবস্থায় তাতে কোন কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজনের সুযোগ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-মানুষ হত্যার শাস্তি স্বরূপ কুরআন মাজীদে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতারও সুযোগ রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না"।[৫৪]

অপর এক আয়াতে আছে, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।[৫৫]

(ছ) নমনীয়তা

শরীআহ আইন চিরন্তন ও স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এতে নমনীয়তারও সুযোগ রাখা হয়েছে। যাতে উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানে মানব জীবন অচল ও স্থবির হয়ে না পড়ে।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "কেউ তার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত"।[৫৬]

প্রতিটি অলংঘনীয় বিধানের পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ বহুবিধ সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাদের জন্য বিকল্প নমনীয় বিধান রেখেছেন।

(জ) ধর্মীয় বিশ্বাসে স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারে। শরীআহ্ আইনের আওতায় তারা ব্যাপকভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে। শরীআহ্ আইনে জঘন্যতম যুলুম ও অমার্জনীয় অপরাধ হল মূর্তিপূজা। কোন মুসলিম স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে উক্ত কার্যে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু অমুসলিমদের বেলায় এই আইন সম্পূর্ণ উদার। তারা ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে মূর্তি গড়তে পারে এবং তারা পূজা-অর্চনা করতে পারেন। এমনকি শরীআহ্ আইনে অমুসলিমদের গালমন্দ করাও মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করা অপরিহার্য কর্তব্য।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে।"[৫৭]

(ঝ) পবিত্রতার ভাবধারা

শরীআহ আইনে পবিত্রতার ভাবধারা বিদ্যমান। শরীআহ আইনের অনুসারী কোন কারণে দৈহিকভাবে অপবিত্র হলে তার অপবিত্রতার মাত্রা অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। নামায আদায়ের জন্য উযু করতে হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসল করতে হয় ইত্যাদি।

(ঞ) সমঝোতার ব্যবস্থা

বিবাদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করার সুযোগ প্রদান শরীআহ আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছ মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৫৮]

ইসলামী আইনে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে সমঝোতাকে উৎসাহিত করে। কাজেই সমঝোতার পথ বেছে নেওয়া উচিত।

(ট) সামঞ্জস্যপূর্ণ

শরীআহ আইনে অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতা বলতে কিছুই নেই। এর গোটা ব্যবস্থাপনাই মানব জাতির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মহানবী হযরত মুহম্মদ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরও উমাইয়া শাসন, আব্বাসী যুগ, উসমানী ও মুঘল শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে এ আইন দ্বারা শত শত বছর ধরে। এমনকি মুঘল আমলের পূর্বেই উপমহাদেশ সুলতানী শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে শরীআহ আইন দ্বারা। শুধু তাই নয় ইউরোপ মহাদেশের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আটশত বছর ইসলামী আইন বা শরীআহ আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের দীর্ঘ এই পরিক্রমায় শরীআহ আইন সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে। উপমহাদেশে বৃটিশ আইন কাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি ছিল ইসলামী আইন, যদিও বাস্তবে তা স্বীকার করা হয় না। আরো জোর দিয়ে বলা যায়, শরীআহ আইনের আরো বহু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি মানবজাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করছে শরীআহ আইন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপর।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, শরীআহ আইন সকল আইনের মূল। কেননা আল্লাহ তাআলা এ আইনের স্রষ্টা। এটি মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভুত নয় বলেই তা সৃষ্টি জীবের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর। বর্তমান বিশ্বে সঠিক আইনের অভাবে যেমন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আইনের ফাঁক, ক্রটিযুক্ত হওয়ায় এবং তার যথার্থ প্রয়োগের অভাবে। শরীআহ আইন যেহেতু কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয় এবং তা কোন বিশেষ মহলের সুবিধার জন্যও নয়; বরং এটি সকল সৃষ্টজীবের জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন, তাই শরীআহ আইনের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

[১] রহমান, গাজী শামছুর, *আইনবিদ্যা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৩১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] হক, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ.৩

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] V.D. Mahajan, *Jurisprudence and Legal Theroy,* India: Eastern Book Company, Law Publishers and Book Sellers, 2003, p. 27.

[৬] Ibid.

[৭] Ibid, p. 29.

[৮] Ibid, p. 30.

[৯] রহমান, গাজী শামছুর, *আইনবিদ্যা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১০] হক, ড.মুহাম্মদ ছাইদুল, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* (অপ্রকাশিত থিসিস), প্রাগুক্ত,পৃ .৬

[১১] আল কুরআন, ৪:১০৫

[১২] আল কুরআন, ৬:৫৭

[১৩] হক, ড.মুহাম্মদ ছাইদুল,*ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকা: প্রাগুক্ত,পৃ .৬

[১৪] রহীম,মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১৬১

[১৫] আল কুরআন, ৩:৮৫

[১৬] আল কুরআন, ৫:৪৪

[১৭] আল কুরআন, ৫:৪৫

[১৮] আল কুরআন, ৫:৪৭

[১৯] আল কুরআন, ৭:৩

[২০] আল কুরআন, ৪:১০৫

[২১] আল কুরআন, ২:১৪৪

[২২] আল কুরআন, ৫:৩-৪

[২৩] আল কুরআন, ৫৯:৭

[২৪] আল কুরআন, ৩:৩১

[২৫] বুখারী, ইমাম, আস-*সহীহ* অধ্যায় : আল আযান, অনুচ্ছেদ : আল আযান লিল-মুসাফিরীন..., , হাদীস নং ৬৩১, পৃ. ৫১

[২৬] নাসায়ী, ইমাম, *সুনান,* অধ্যায়: মানাসিকুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : আর-রাকুবু ইলাল যিমারী ওয়াহ ইসতিজলামুল মুহরিম, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০ হাদীস নং ৩০৬৪, পৃ. ২২৮৪

[২৭] আল কুরআন, ৩৩:৫০

[২৮] মুল্লা জিউন, আহমদ, *নুরুল আনোয়ার,* মাবহাসুল ইজমা, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ১৩৯৬, পৃ. ৩১৬

[২৯] আল কুরআন, ৪:৫৯

[৩০] আল কুরআন, ১৬:৪৩

[৩১] ইবনে মাজা, ইমাম, *সুনান,* আল-কুতুবুল সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, অধ্যায়: আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ: আস-সাওয়াদুল আযাম, আল-আযাম, পৃ. ২৭১৩, হাদীস নং ৩৯৫০

[৩২] মুল্লা জিউন, আহমদ, *নুরুল আনোয়ার,* মাবহাসুল কিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৫

[৩৩] হক, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* (অপ্রকাশিত থিসিস), প্রাগুক্ত, পৃ . ১৬

[৩৪] আল-বাগদাদী, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আবু আহমাদ, *আল-কুদুরী আল-মুকতাসার ফিল ফিকহ,* ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, তাঃ বিঃ, খ. ২, পৃ. ২০৪

[৩৫] শাতিবী, ইমাম, *আল-ইতিসাম,* আল-মাকতাবা আত-তাওফিকিয়া, তা.বি. খ. ২, পৃ. ১১৮

[৩৬] মুল্লা জিউন, আহমদ, *নুরুল আনোয়ার,* মাবহাসুল ইসতিহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৪

[৩৭] আল কুরআন, ৩৯ঃ১৭-১৮

[৩৮] আল কুরআন, ৭ঃ১৪৫

[৩৯] হক, ড.মুহাম্মদ ছাইদুল, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* (অপ্রকাশিত থিসিস), ঢাকাঃ পৃ .১৮

[৪০] রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ১, ২য় ভাগ, পৃ. ২৫

[৪১] মুল্লা জিউন, আহমদ, *নুরুল আনোয়ার,* মাবহাসুল ইজতিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

[৪২] আমীমুল ইহসান, আল-মুফতী আস-সায়্যিদ, *কাওয়াইদুল ফিকহ,* দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৩৮১/১৯৯১, পৃ. ১৭২

[৪৩] রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* প্রাগুক্ত, খ. ১, ২য় ভাগ, পৃ. ৩০

[৪৪] আল কুরআন, ২:৩৮

[৪৫] আল কুরআন, ৬:৫৭

[৪৬] আল কুরআন, ১২:৪০

[৪৭] আল কুরআন, ৪০:১২

[৪৮] আল কুরআন, ২:৮৫

[৪৯] আল কুরআন, ৭:১৫৮

[৫০] বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আত-তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণীঃ ফালাম তাজিদু মাআন ফাতাইয়াম্মামু সায়ীদান তায়্যিবা ... পৃ. ২৯, হাদীস নং ৩০৫

[৫১] মুসলিম ইমাম, *আস সহীহ,* আল-কুতুবুল সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ : আল-মাসাজিদু ওয়া মাওয়াদিউস-সালাহ, হাদীস নং ১১৬৩, পৃ. ৭৫৯

[৫২] আল কুরআন, ৫:৩

[৫৩] আল কুরআন, ৪৮:২৮

[৫৪] আল কুরআন, ১৭:৭৭

[৫৫] আল কুরআন, ৩৩:৩৬

[৫৬] আল কুরআন, ১৬:১০৬

[৫৭] আল কুরআন, ৬:১০৮

[৫৮] আল কুরআন, ২:১৭৮

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ৯৫-১১০

শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থার সংশোধন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

নাহিদ ফেরদৌসী*

সারসংক্ষেপ

[বাংলাদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধ একটি বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়াটা শিশু-কিশোরদের অনিচ্ছাকৃত। বয়সের অপরিপক্কতা, বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন: চুরি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও কেনাবেচা, খুন, নারী নির্যাতন, বিস্ফোরক ও অস্ত্র পাচার, ইভটিজিং (মেয়েদের উত্যক্ত করা), রাস্তায় পিকেটিং করা ইত্যাদি। এদের অপরাধ সামাজিক উপায়ে প্রতিরোধ করার পাশাপাশি বড়দের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিচার করার জন্য ১৯৭৪ সালে শিশু আইন পাস করা হয়েছে। এ আইনে শিশু-কিশোর অপরাধীদের কারাগারে বয়স্ক বন্দিদের সাথে না রেখে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখারও বিধান করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী কারাগার কখনই শিশু-কিশোরদের স্থান নয়। কিন্তু বাস্তবে আইনের প্রয়োগ না করা ও শিশু আইন সম্পর্কে অসচেতনতার জন্য শিশু-কিশোরদের সঠিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না। বরং শিশু-কিশোরদের কারাগারে অবস্থান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে এসব শিশু-কিশোরের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যানও নেই। এমনকি অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের কোনো একক শিশুবান্ধব বিচারব্যবস্থাও নেই। দেশের বেশিরভাগ আদালতে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার অধীনে বড়দের সাথে তাদের বিচার হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটি যদিও শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থার মূল আইন কিন্তু কোনোরূপ যুগোপযোগী করা ছাড়াই আইনটি গত ৩৬ বছর ধরে চলে আসছে। তবে ১৯৯০ সালের আগে বলতে গেলে এই আইনটির কোনো প্রয়োগ ছিল না। এরপর গত ২০ বছরে শিশু সংক্রান্ত আইন বিষয়ে সচেতনতা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও পৃথক শিশুবান্ধব বিচার ব্যবস্থার অভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা

---

*সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এসব শিশু-কিশোর। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের শৈশব, কৈশোর এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিশু ও কিশোর বিচার ব্যবস্থার সংশোধন এবং যুগোপযোগী করে তোলা আবশ্যক। এ পর্যায়ে শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষে শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থার পটভূমি, বাংলাদেশে শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি, বাস্তব অবস্থা, ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ, করণীয় বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হবে।]

শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থার পটভূমি

বাংলাদেশের শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থা মূলত ভারত উপমহাদেশের আইন ব্যবস্থা থেকে এসেছে। শিশু-কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে আলাদা শাস্তির ধারণা সূত্রপাত হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে। বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান শাসকরা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশ শাসন করতেন এবং এসময়ে হিন্দু ও মুসলিম আইন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম আইনের কোনটিতে নির্দিষ্টভাবে কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কোনো ধরনের আইন ছিল না।

দ্য এপ্রেন্টিস এ্যাক্ট, ১৮৫০ সরাসরি শিশু-কিশোর অপরাধ সংশিষ্ট বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রণীত আইন। দু:স্থ ও অপরাধী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার লক্ষে এটি শুরু হয় এবং এটা ছিল প্রথম আইনগত প্রচেষ্টা। শিশু-কিশোর অপরাধ সংশিষ্ট পরবর্তী প্রচেষ্টা ছিল দ্য রিফরমেটরী এ্যাক্ট, ১৮৭০। ১৮৯২ সালে তৎকালীন প্রিজন কনফারেন্সের কিছু সুপারিশ অনুযায়ী এই রিফরমেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার শিশু-কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করে।

১৯১৯-১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান জেল কমিটি ও শিশু-কিশোরদের যত্ন ও স্বার্থ রক্ষার 'জেনেভা ঘোষণা' জনগণের মধ্যে নতুনভাবে আগ্রহ জাগায়। মাদ্রাজ শিশু আইন, ১৯২০ ছিল ভারতে এ সংক্রান্ত প্রথম আইন। এরপর দ্য বেঙ্গল চিলড্রেনস এ্যাক্ট, ১৯২২ পাশ হয়। এসব আইনে শিশু-কিশোর আদালত, প্রবেশন সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আটক নিবাস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থার বিধান রাখা হয় যা শিশু কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯১৪ সালে ভারত-উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আটক নিবাসসহ একটি কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু-কিশোরদের সুরক্ষার বিষয়টি এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম দ্য বেঙ্গল চিলড্রেনস এ্যাক্ট, ১৯২২ এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তীতে শিশু-কিশোরদের আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদের বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ ছিল শিশুকে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে সুরক্ষা করা।[১]

পাকিস্তান আমলে দ্য প্রবেশন অর্ডিন্যান্স আইন ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৬৪) প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় কোনো শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে জেলখানায় রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত কেবল রিফরমেটরী স্কুল মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। পাকিস্তান আমলে ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের মুরাপাড়ায় একটি ব্রোস্টাল স্কুল ছিল যা রিফরমেটরী স্কুল হিসেবে কাজ করতো। এটি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল আবাসিক প্রতিষ্ঠান। এতে ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, শিশু-কিশোর অপরাধীদের সাধারণ আদালতে বিচার কাজটি সম্পাদিত হওয়ার পর সংশোধনের জন্য স্কুলে প্রেরণ করা হতো। তবে এই প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী বা প্রশিক্ষণের সুবিধাদি প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছিল।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। দ্য রিফরমেটরী এ্যাক্ট, ১৮৭০, দ্য বেঙ্গল চিলড্রেন্স এ্যাক্ট ১৯২২, দ্য প্রবেশন অর্ডিন্যান্স আইন, ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৬৪) ইত্যাদি আইনের ধারাবাহিকতায় শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিকাশ ঘটে। এ শিশু আইনের দ্বারা পূর্ববর্তী দ্য বেঙ্গল চিলড্রেনস এ্যাক্ট, ১৯২২, এবং দ্য রিফরমেটরী এ্যাক্ট, ১৮৭০ রহিত হয়েছে, পরবর্তীতে শিশু আইনকে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য এই আইনের আওতায় ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রণীত হয়। এছাড়া ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালায় দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, শিশু-কিশোরদের বিচারব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক বা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল লক্ষ্য শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ কার্যকর হওয়ার পর থেকে কিশোর অপরাধ বিচার একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪-এর মূলনীতিও যেকোন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর জন্য শাস্তি নয় বরং সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ আইনে অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচের বয়সী শিশু দ্বারা যে কোনো অপরাধ শিশু-কিশোর অপরাধ ও এ ধরনের

অপরাধকাজে জড়িত শিশুদের 'শিশু-কিশোর অপরাধী' বলে এবং এরা শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ পায়।

শিশু আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী শিশু-কিশোর সংশোধনের জন্য ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ২০০ আসন বিশিষ্ট, ১৯৯৫ সালে যশোর জেলার পুলেরহাটে ১৫০ আসন বিশিষ্ট, ছেলে শিশুদের জন্য ২টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ২০০৩ সালে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়িতে ১৫০ আসন বিশিষ্ট ১টি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র মোট ৩টি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উল্লেখিত কেন্দ্রগুলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থাপনার জন্য শিশু আইন ১৯৭৪, শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এবং প্রবেশন অফেন্ডার আইন, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত) প্রচলিত আছে। শিশু আইন এবং এর সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত বিচার, তত্ত্বাবধান, প্রতিরক্ষা ও শিশুদের প্রতি আচরণ এবং কিশোর অপরাধীদের শাস্তি সংক্রান্ত বিধান করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সীরা শিশু হিসেবে গণ্য।[৩] ১৬ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুর বিচারের ক্ষেত্রে আদালতকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো-ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স; খ) শিশুর জীবন যাপন প্রেক্ষাপট; গ) প্রবেশন কর্মকর্তার তথ্য প্রতিবেদন এবং ঘ) শিশুটির স্বার্থে আদালতের পরামর্শ মোতাবেক এ রকম অন্য যে সব ব্যাপার বিবেচনায় আনা উচিত।[৪]

এছাড়া এ আইনের অধীনে কিছু মৌলিক নিয়ম বিধি আছে, যা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন: গ্রেফতার হবার সাথে সাথেই শিশুটির বয়স সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, গ্রেফতারকৃত শিশুকে বড়দের থেকে আলাদা তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে, শিশুদেরকে কিশোর আদালতের মাধ্যমে বিচার করতে হবে, কোনো শিশুর জন্য যদি স্বাধীনতা রহিত করা প্রয়োজন হয় তাহলে শিশুর বৃহত্তর স্বার্থে তাকে রিমাণ্ড হোম, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু আইনে বিচারের আগে ও পরে শিশুদের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ আইনে বলা হয়েছে, কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্র ছাড়া শিশুদেরকে কারাগারে নেওয়া যাবে না এবং এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুদের কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।[৫] শিশু আইনের ৫১ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অন্য কোনো আইনে এর সাথে

অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাই থাকুন না কেন, কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। যদি আদালত দেখে যে, শিশুটি এমন কোনো অপরাধ করেছে যে, আইনে এর জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা পর্যাপ্ত নয় বা আদালত যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিশুটি এতটাই নির্মম ও কলুষিত চরিত্রের যে তার জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য উপায়গুলো উপযুক্ত নয়।[৬]

এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে যে, কোনো অবস্থাতেই কারাদণ্ডের সময়কালে শিশুদেরকে কারাগারে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একসঙ্গে রাখা যাবে না। আইনের ৫২ ধারা আদালতকে বিচক্ষণতার সাথে যে শিশুরা মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদেরকেও অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে বলা হয়েছে। আইনের আদেশে স্বাধীনতা হরণের বিষয়ে আরো বলা হয়েছে, যদি আদালত কোনো কিশোর অপরাধীকে কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৫২ ধারা অনুযায়ী আটক রাখার পরিবর্তে এটা প্রযোজ্য মনে করে যে, তাকে উপযুক্ত হুঁশিয়ারী প্রদানের পর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে বা প্রবেশনে কোনো ধরনের নিশ্চয়তাসহ বা নিশ্চয়তা ছাড়া, আদালত যেমনটি উচিত বিবেচনা করবেন সে ভিত্তিতে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া যে, সে ভালো হওয়ার এবং পিতা-মাতা বা অভিভাবক বা অন্য কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মীয় বা যোগ্য অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকার এবং স্বভাব ভালো করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি এই মর্মে একটি হলফনামায় সম্মতি জানাবেন যে, তারা ঐ শিশু বা কিশোর অপরাধীর আচরণ ভালো করার ব্যাপারে যত্নবান থাকবে। প্রবেশনে এরূপ মুক্তির সময়সীমা আদালত নির্ধারণ করবে এবং তা কোনোক্রমেই ৩ বছরের বেশি হবে না এবং আদালত কিশোর অপরাধীকে কোনো প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে দেওয়ারও নির্দেশনা দিতে পারে না।[৭]

এছাড়া ১৯৮৯ সালের আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ৪০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, শিশু বিষয়ক বিচারের মূল ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা , যাতে শিশুর বয়সের সাথে সংগতি রেখে তার প্রতি আচরণ করা হয়।[৮] উল্লেখ্য যে, শিশুর মুক্তির সম্ভাবনা উন্মুক্ত না রেখে বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসনের সমুদয় সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করাকে আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই শিশুর প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত। কেননা মহানবী স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেনা এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[৯]

এসব আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও শিশুদের যথেচ্ছাভাবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অধীনে বিচার করা হয় এবং এ ব্যবস্থায় তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়। শিশু

যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে তারা হয়তো ২ বা ৩ বছর কারাদন্ড ভোগ করেছে। এছাড়া কারাগারে তাদের পর্যাপ্ত খাবার, পোশাক, শৌচাগার, ঘুমানোর স্থান, শিক্ষা সুবিধা দিতে পারছে না, খুব সামান্য অপরাধের জন্য দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়। অনেক সময় হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণসহ চাঞ্চল্যকর মামলার আসামিদের সঙ্গে এসব শিশু-কিশোর রাখা হয়ে থাকে।

১২-০৮-২০০৯ তারিখে বিভাগওয়ারী কারাগারে আটক শিশু কিশোর-কিশোরীদের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অনূর্ধ ১৬			অনূর্ধ ১৬-১৮			মন্তব্য
		কিশোর	কিশোরী	মোট	কিশোর	কিশোরী	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	ঢাকা বিভাগ	১৪	০৫	১৯	২৮	০৪	(১৯+৩২)=৫১	➤ অনূর্ধ ১৬ বছর বয়সের শিশু-কিশোর কারাগারে আটক রয়েছে ৬৭ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলা মোট=৮৪ জন। ➤ নূর্ধ ১৬-১৮ বছর বয়সের ১২ জন মহিলা মোট=১৩৩ জন। বর্তমানে ২১৭ জন কারাগারে আটক আছে। ➤ ০১ জন প্রবেশনের মাধ্যমে কারাগার হতে মুক্তি পেয়েছে।
০২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৫	০২	১৭	৪০	০১	(১৭+৪১)=৫৮	
০৩	রাজশাহী বিভাগ	১৯	০৪	২৩	৩৩	০৩	(২৩+৩৬)=৫৯	
০৪	খুলনা বিভাগ	০৫	-	০৫	০৩	-	(০৫+০৩)=০৮	
০৫	সিলেট বিভাগ	১০	০৫	১৫	১৭	-	(১৫+১৭)=৩২	
০৬	বরিশাল বিভাগ	০৪	০১	০৫	০৩	০১	(০৫+০৪)=০৯	
মোট =		৬৭	১৭	৮৪	১২৪	০৯	২১৭	

উৎস: সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

এভাবে যখন শিশুদেরকে আদালতে নেওয়া হয় এবং শাস্তি দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সত্যিকারের অপরাধী হিসেবে ভাবতে শুরু করে এবং অপরাধীর ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে । যারা অপরাধী হিসেবে শাস্তি পেয়ে কারাগারে থাকে, তারা আরো অন্যান্য অপরাধীদের সাথে পরিচিতি হয় এবং তাদের কাছ থেকে অপরাধের দক্ষতা, ভাষা ও সংস্কৃতি রপ্ত করে, যা তাদেরকে আরো বড় ধরনের অপরাধ করতে উৎসাহিত করে। একবার যদি শিশু ও কিশোররা নিজেদের এবং সমাজের কাছে অপরাধী প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের স্কুল, কর্মক্ষেত্র ও পরিবারের সাথে মানিয়ে চলার ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে পড়ে। তাই মনে করা

হয় যে, শিশুদেরকে আদালতের প্রক্রিয়া এবং পুলিশ হেফাজত থেকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে রাখা উচিত। অনেক সময় প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা জেলাখানায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোররা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া সঠিক সময়ে আদালত না বসার কারণে শিশুরা বেশি সময় পুলিশ হেফাজতে থাকে। যদি তাদের পরিবার থেকে জামিন না নেওয়া হয় তাহলে তারা বছরের পর বছর কারাগারে আটক থাকে।

শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

বর্তমান শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় তা হলো–

১. শিশু-কিশোরদের একক বিচারব্যবস্থার অভাব

আমাদের দেশে শিশু ও কিশোরদের জন্য একক ও পৃথক কোনো বিচারব্যবস্থা নেই। কিশোর আদালত বলতে শিশু আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যথা– টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩টি কিশোর আদালত আছে। শিশু আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টসহ ৬৪ জেলার ৬৪ টি দায়রা আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চীফ জুডিশিয়াল মেট্রোপলিটন আদালত কিশোর আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে দেশে প্রতিটি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতসহ অন্যান্য সকল আদালত শিশু বিষয়ক মামলা পরিচালনার সময় কিশোর আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও সব জেলার সঠিকভাবে এটি পালন করা হয় না। প্রতি জেলায় শুধু শিশু-কিশোরদের সব ধরনের মামলা পরিচালনার জন্য পৃথক কোনো কিশোর আদালত না থাকায় অপরাধ সংঘটনের স্থানে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের বড়দের সাথে বিচার হচ্ছে এবং তাদেরকে কারাগারে থাকতে হচ্ছে।[১৩] বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার পর প্রায় ৩ বছরেও কোনো আদালতকে শিশু আইনের আলোকে 'কিশোর আদালত' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি।

২. শিশু সুরক্ষার একক আইনের অভাব

বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষার বেশ কিছু আইন থাকলেও মূল সমস্যা হলো সেগুলি বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, একটি সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৪] ফলে আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। বাংলাদেশ সংবিধান, দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, কারা আইন ও ভবঘুরে আইনসহ বিভিন্ন আইন আছে। শিশুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন হলো শিশু আইন, ১৯৭৪ ও শিশু বিধি, ১৯৭৬। প্রচলিত আইন শিশু-কিশোরদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমনকি আইনসমূহ আন্তর্জাতিক

মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য নয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরদের বিচারসহ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন নেই।

৩. শিশুর বয়স নির্ধারণে আইনগত জটিলতা

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞায় বিভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করা আছে এবং শিশুর বয়স সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনারও অভাব রয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের বয়সী সবাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী শিশু অর্থ অনধিক ১৬ বছর বয়সের কোনো ব্যক্তি। আবার জাতীয় শিশুনীতি ১৯৯৪ অনুযায়ী ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলেমেয়েদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। ১৮৬০ সালের দণ্ড বিধি অনুযায়ী ৯ বছরের কম (সম্প্রতি ৭ থেকে ৯ করা হয়েছে) বয়সের শিশু নিরপরাধ এবং ৭ বছরের ঊর্ধ্বে ও ১২ বছরের নিচের শিশু, যার বুদ্ধির পরিপক্কতা হয়নি সে নিরপরাধ বিবেচিত হবে। তবে শিশু আইনে শিশুর বয়স দুইভাবে বর্ণনা করায় আরো জটিলতা বেড়েছে। এ আইনের ২ (চ) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৬ বছর বা ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি। অন্যদিকে ৫১ ও ৫২ ধারায় শিশুকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস বা আদালত কর্তৃক কোনো আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে আটক রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১৬ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দুই ধরনের বয়সের উল্লেখ থাকায় আইনটিও সহজভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এক্ষেত্রেও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সাথে আমাদের দেশের আইনের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৪. কিশোর আদালতের বিচারিক সীমাবদ্ধতা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোর আদালত শিশু-বান্ধব পরিবেশে বিচার করলেও এই আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতার এখতিয়ার, কর্তৃত্ব এবং বিবেচনা অত্যন্ত সীমিত। শিশু আইনের ৫(৩) ধারা অনুযায়ী গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত শিশুর বিচার এ আদালত আমলে নিতে পারে না। ধারায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে, কোনো কিশোর আদালত বা ৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত দায়রা আদালতের আওতায় এরূপ কোনো আদালতের কাছে যদি প্রমাণ হয় যে, যে অপরাধে কোনো শিশু বা কিশোর অভিযুক্ত হয়েছে তা কেবল দায়রা আদালতেই বিচারযোগ্য, তখন মামলাটি অবিলম্বে দায়রা আদালতে, এ আইনে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বদলী করবে।[৮] কিন্তু ও ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রে অবস্থিত কিশোর আদালতসমূহ অপরাধী শিশু ও কিশোরদের যে

কোনো ধরনের বিচার করার জন্য সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ শিশু আইনের ৫ এবং ৬ ধারা দুটি পরস্পর বিরোধী। যেহেতু কিশোর আদালত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বাইরে শিশুদের জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা সেহেতু ফৌজদারি আইন অনুযায়ী এ আইনের এখতিয়ার নির্ধারিত থাকা উচিত নয়।

এছাড়া কিশোর আদালতের এলাকাভিত্তিক এখতিয়ার জেলার মধ্যে সীমিত। ১৯৯৮ সালের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই তিনটি বিভাগ টঙ্গী কিশোর আদালতের অন্তর্ভুক্ত এবং খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল—এই তিনটি বিভাগ যশোর কিশোর আদালতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ভৌগোলিক বণ্টন অনুযায়ী প্রতি তিনটি বিভাগের জন্য একটি করে কিশোর আদালত রয়েছে। তবে টঙ্গী ও যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের 'কিশোর আদালত' শুধু ছেলে শিশুদের জন্য। সারা দেশের মেয়ে শিশুদের বিচারের জন্য কোনাবাড়ি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একটি মাত্র কিশোরী আদালত রয়েছে যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। একজন প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্টাফ নিয়ে এই আদালত গঠিত। অন্য আরেকটি সমস্যা হলো, কিশোর আদালতসমূহের বিচারক পদটি স্থায়ী হলেও বিচারক স্থায়ী নয়। সংশ্লিষ্ট জেলার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কিশোর আদালতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সপ্তাহে সাধারণত একদিন বা দু'দিন বেলা ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত উক্ত আদালত বসে যা শিশু-কিশোরদের সংখ্যা অনুপাতে বিচারের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া দূরত্বের কারণে এ আদালত ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত শিশু-কিশোরদের আদালতে উপস্থাপন ও সাক্ষী উপস্থাপন করাসহ নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে কিশোর আদালতগুলো তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুসারে কাজ করতে পারছে না।

৫. ফৌজদারি ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের বিচার বিষয়ে অবহেলা

শিশু-কিশোরদের অপরাধের বিচার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ ও ধরন এবং তাদের অধিকার, মানবিক মর্যাদা, সংশোধনের সুযোগ ও অন্যান্য কল্যাণকর দিকসমূহ আইন মোতাবেক অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিশু আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত আছে আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে: (ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স (খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ (গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট এবং (ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনা করবে বলে আদালত মনে করেন সে সকল বিষয়। আইনের সংস্পর্শে

জড়িত শিশু-কিশোরদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আদালতকে অবশ্যই এ ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে।
কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদালত শিশু ও কিশোরদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রবেশন অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতে না নিয়ে পুলিশ অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতে নিয়ে থাকেন। এসব আদালতে শিশু ও কিশোরকে পরিণত মানুষের মতই ভাবা হয় এবং তাদের বিচার সেভাবেই করা হয়ে থাকে। তাছাড়া একই আদালতে বড়দের ও শিশুদের ভিন্ন মানসিকতায় বিচার করার বিষয়টি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে শিশু-কিশোরদের বিচার নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয় না।

৬. শিশুবান্ধব কার্যবিধির অপ্রতুলতা

অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরটির প্রথমেই পুলিশ বা আদালত বয়স নির্ধারণ করে থাকে, এক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যক্রমে কেইস ওয়ার্কার অথবা মেডিক্যাল অফিসারের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। গ্রেপ্তারের পর থেকে শিশু-কিশোদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কোনো শিশুকে গ্রেফতার করার সময় শিশুটির বয়স লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ফরমে নির্দিষ্ট করে বয়স লিপিবদ্ধ করার পৃথক কোনো ঘর থাকে না। ফলে পুলিশ অফিসারদের শিশুর নামের পাশে বয়স লিখতে হয়। শিশুর বিচার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ এই সেক্টরে এখনো পুরোনো ফরম প্রচলিত থাকায় বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে, আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রচলনে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত।[১৫] এছাড়াও বিভিন্ন আইনে শিশুর বিভিন্ন বয়স উল্লেখ থাকায় অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর বয়স নির্ধারণে পুলিশ অফিসারদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রায় অনেক মামলায় নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী এড়িয়ে চলার জন্য শিশুটির বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার নজির দেখা যায়। ফলে বেশিরভাগ সময় শিশুদের কারাগারে আটক থাকতে হয়। এভাবে আইনের সুস্পষ্ট বিধানের অভাবে শিশু হিসাবে একটি শিশুর যা প্রাপ্য ছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

৭. শিশু-কিশোরদের জামিনে মুক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের প্রবণতা

বিচারাধীন অবস্থায় শিশু-কিশোরদের মুক্ত করার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে জামিন । এ বিষয়ে শিশু আইনের বিধান ফৌজদারি কার্যবিধির চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭(১) ধারা অনুযায়ী ১৬ বছরের নিচের বয়সী শিশু-কিশোরদের আদালত জামিন দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু শিশু আইনের ৪৮ ধারা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে জামিনের ক্ষমতা দিয়েছে। এই ধারার প্রয়োগে গ্রেপ্তার

হওয়ার সাথে সাথেই অনেক শিশু ও কিশোর সহজেই মুক্ত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, জামিনে শিশু-কিশোরদের মুক্ত করার ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে বরং তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন- যে শিশু-কিশোররা আইন ভঙ্গ করে তাদের কারাগারে বা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কিছু শিশু-কিশোরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে না পাঠিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে কারা আইন, ১৮৯৪ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সীদের বড়দের থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থাও মেনে চলা হয় না। ফলে শিশুরা কারাগারে থেকে ভাল হওয়ার চেয়ে পেশাদার অপরাধীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তারা বড় অপরাধী হয়ে উঠে এবং তাদের মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

৮. ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল প্রবেশন অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোরদের তালিকা সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া আছে। শিশু আইনের অধীনে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব শিশুর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার শাস্তি ও সমাজে পুনর্বাসন ও একত্রকরণ পর্যন্ত। সে কারণে শিশুর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবেশন অফিসারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছে। বাকী ৪২টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলায় প্রবেশন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু এখনো তা অনুমোদন করা হয়নি। উক্ত ৪২ জেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করছে। যার ফলে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশু আইনের বিধান মোতাবেক শিশু ও কিশোরদের আটক পরবর্তী পুলিশ অফিসার প্রবেশন অফিসারকে এ বিষয় সর্ম্পকে অবগত করবেন। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ সময় তারা এসব বাড়তি ঝামেলা এড়িয়ে যায়। ফলে অনেক সময় বিচারব্যবস্থা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে না।

৯. শিশু আইন বাস্তবায়ন না হওয়া

প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধানসমূহ অগ্রাহ্য করে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা, মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশের ৮৬ ধারা, ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ অনুযায়ী গ্রেফতারের শর্তসমূহ অনুসরণ ছাড়াই শিশু ও কিশোরদের গ্রেফতার ও আটক করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা শিশু ও

বিরোধীদের স্বাধীনতা হরণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এই আইন অনুযায়ী পুলিশ যে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ধরণের পরোয়ানা ছাড়াই শুধু সন্দেহবশত গ্রেফতার ও আটক করার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। ৫৪ ধারা অনুসারে আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনের পরেই কেবল তাকে বেশি সময়ের জন্য আটক রাখা যায়। কিন্তু বাস্তবে এই ধারাটির যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ হয় এবং কোন ধরনের পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শিশুদের গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখে।

১০. শিশুর সংশোধনের জন্য প্রবেশন আইন ব্যবহার না করা

অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রবেশন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শিশুর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু প্রত্যাশানুযায়ী আমাদের দেশের প্রবেশন কার্যক্রম কোনো রকম নজির সৃষ্টি করতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে প্রবেশনে মুক্তি দিয়ে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায় না।

শিশু আইনের অধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব শিশু অপরাধীর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও সমাজে তাকে পুনর্বাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। আইন অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর গ্রেফতারকৃত শিশুর সমস্ত দায়দায়িত্ব প্রবেশন কর্মকর্তাদের। প্রবেশন কর্মকর্তা তখন পূর্ববর্তী সব ঘটনা ও পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করবে, যা আদালতকে তার নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে পুলিশ অফিসার প্রবেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার নজির দেখা যায় না। ফলে এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কাজ হয় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, প্রবেশন আইনটি ১৯৬৪ সালে সংশোধিত হলেও ৪৬ বছর ধরে আমাদের দেশে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনার কোনো নীতিমালা তৈরী হয়নি। এমনকি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসারও নেই। শিশু আইনের সাথে প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলে শিশুদের অপরাধ মুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

শিশু ও কিশোর বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ উত্তরণে প্রস্তাবসমূহ

১. শিশু আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ যেমন ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ ইত্যাদি বাতিল করতে হবে এবং শিশু-কিশোর বিচার ব্যবস্থায় শিশু আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

২. শিশু-কিশোরদেরকে আইনে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

৩. দেশের প্রতিটি বিভাগে কিশোর আদালত স্থাপন করা।

৪. প্রতিটি জেলায় একজন করে শিশু-বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টভাবে রাখা প্রয়োজন।

৫. কারাবন্দি শিশু-কিশোরদের আটকাবস্থা নিরসনে শিশু আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. গ্রেফতারকৃত শিশুদের থানা থেকেই জামিন প্রদানের বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুদের যদি থানা থেকেই জামিনে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহলে বেশিসংখ্যক শিশু অহেতুক হয়রানি হাত থেকে রক্ষা পারে এবং কারাগারে শিশু প্রেরণের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা ৪৮ যথাযথ বাস্তবায়ন করা দরকার।

৭. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি লাভের পর শিশু-কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন ও পুন:একত্রকরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন।

৮. কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার লক্ষ হতে হবে এরূপ, যে শিশুরা আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাদের প্রতি এমন আচরণ করা যাতে সেই শিশু-কিশোরটির সংশোধন ঘটে, পরিবারের সাথে সে পুনরায় একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারে পারে এবং সমাজে সে পুনর্বাসিত হতে পারে।

উপসংহার

সব ধরনের অপরাধীদের মধ্যে শিশুরাই সবচেয়ে দুর্বল ও নাজুক। তারা নিজেদের কথা নিজেরা বলতে পারে না। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে প্রচলিত কিশোর আদালত ও ফৌজদারি আদালত কোনো ব্যবস্থাতেই শিশু-কিশোরদের সুরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অসংখ্য শিশু-কিশোর কারাগারে ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা, তত্ত্বাবধান ও সংশোধনের জন্য প্রতিটি জেলায় পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে একটি করে কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা বা সাধারণ আদালতে

সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব নিয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশে শিশুদের বিচার সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। আটকাবস্থাকে সর্বশেষ পন্থা এবং যথাসম্ভব স্বল্পতম মেয়াদের জন্য প্রয়োগ করার পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শিশু-কিশোর গ্রেফতার হলে তদন্তকালীন, বিচারাধীনকালে, আটকাবস্থায়, রায় প্রাপ্তিতে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। অপরাধী শিশু-কিশোর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখা এবং পর্যবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবেই ভবিষ্যতে অপরাধ বাড়ছে না কমছে তা হিসাব করে পরবর্তী বিকল্প কর্মসূচী নেওয়া সহজ হবে। মূলতঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় আইনেই সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী শিশু-কিশোররা যেন হতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আশার কথা, শিশু আইন ১৯৭৪ এর সংশোধিত শিশু আইন (খসড়া) ২০১০ তৈরি হয়েছে যা শিশু-কিশোরদের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Ved Kumari, *The Juvenile, Justice in India : From Welfare to Rights*, New Delhi: Oxford University Press, First Edition, 2004, P.57.
২. মালিক, শাহদীন, *শিশু আইন, ১৯৭৪: একটি পর্যালোচনা*, ঢাকা : সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউকে, ২০০৫, পৃ. ৩০, ৩৪
৩. *শিশু আইন*, ১৯৭৪, ধারা ২ (ছ)
৪. *শিশু আইন*, ১৯৭৪
৫. চৌধুরী, আফসানা ও অন্যান্য, *নিরাপদ হেফাজতে আমাদের মেয়েরা*, ঢাকা: সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউকে, ২০০৫, পৃ. ১৪
৬. *শিশু আইন* ১৯৭৪, ধারা ৫১
৭. প্রাগুক্ত, ধারা ৫২
৮. *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, অনুচ্ছেদ ৪০
৯. তিরমিযী, ইমাম, *জামে তিরিমিযী*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচেছদ : ১৫
১০. *শিশু আইন* ১৯৭৪, ধারা ৫৪
১১. *সমাজ সেবা অধিদপ্তর*, ঢাকা
১২. *রিপোর্ট*, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, ২০০৬
১৩. Rahman, Mizanur ,*Tracing the Missing Cord: A Study on the Children Act, 1974*, Dhaka: Save the Children UK, 2003, p.34.
১৪. Chowdhury, Afsan, and *et al.*(edited), *Our Children in Jail*, Year Book on the State of Juvenile Justice and Violence against Children in Bangladesh, Dhaka: Save the Children UK and Odhikar, 2001, p. 6.
১৫ Karzon, Sheikh Hafizur Rahman *Theoretical and Applied Criminology*. Dhaka: Palal Prokashoni, 2008, p. 378.

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ১১১-১২৮

সুলতানী আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (১২৯৬-১৫৪৫) : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড.মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

[১২০৩-৪ সালে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি (১২০৩-০৬)-র অতর্কিত আক্রমণে যে দিন রাজা লক্ষণ সেন (১১৭৯-১২০৫) নদীয়া ছেড়ে পূর্ববঙ্গের পথে পা বাড়ান, মূলত সেদিন থেকেই বাংলায় সুদীর্ঘ হিন্দু শাসনের সূর্য অস্তমিত হয় এবং সুলতানী শাসনের গোড়াপত্তন হয়। মূলত একটি কেন্দ্রিয় সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অধীনে বাংলাব্যাপী মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ করতে মুসলমানদের আরও প্রায় ২৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অতঃপর বর্তমান বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্য দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। মোগল শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত (১৫৭৫-৭৬) বিভিন্ন সময়ে (অন্তর্বর্তীকাল হিসাবে রাজা গনেশের সময় ১৪১৫-১৪১৮ ব্যতীত) কমবেশি ৫৫ জন মুসলিম সুলতান এদেশ শাসন করেন। ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দু'শত বছর ইলিয়াসশাহী ও তৎপরবর্তী সুলতানগণ দিল্লির সুলতানদের মতই স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন। সুলতানী শাসন আমলে ভূমি রাজস্ব নীতির প্রথম ও প্রধান ভিত্তি ছিল শরীয়তের নির্দেশ ও আব্বাসীয় খলীফা, গজনির শাসক ও ঘোরী সুলতানদের অনুসৃত ঐতিহ্য। সুলতানী আমলে অনেক সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে বিশেষত সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহতকরণে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সুলতানদেরকে ভূমিকর বৃদ্ধি করতে হতো। এই বৃদ্ধি প্রাথমিক সুলতানদের রাজত্বকালে ততো বেশি না হলেও কখনও কখনও তা প্রজাসাধারণের বহনের সীমা ছাড়িয়ে যেত। প্রসঙ্গত মুহম্মদ ইবনে তুগলকের সময়ে অত্যধিক হারে কর বৃদ্ধির কথা বলা যায়। এর ফলে সেখানে ব্যাপক প্রজা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, যা প্রকারান্তরে তার শাসনের ভিতকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। নিম্নে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুগলক, সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক ও সম্রাট শেরশাহ এর যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি চিত্র

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

তুলে ধরা হয়েছে এবং এর সাথে বাংলাদেশের ভূমি রাজস্বের বিষয় ও আলোচনা করা হয়েছে।]

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬)

প্রাথমিক যুগের দিল্লির সুলতানদের অনুসৃত ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য আমাদের নিকট খুবই সীমিত। তবে এ সময়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক সুলতান আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালের ভূমি রাজস্ব ও কৃষি বিষয়ক কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মূলত সুলতানী যুগের ভূমিরাজস্বের ইতিহাস তার আমল থেকেই শুরু হয়। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিই প্রথম একটি মজবুত ভিত্তির উপর ভূমিকর বা রাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। ভূমিকর বা রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে তিনি পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. সাম্রাজ্যের সকল প্রকার ভূখণ্ড যেমন 'খালিশা'[২] ও 'জায়গির'[৩] ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রের নিরংকুশ মালিকানা ও অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর রায়তকে ভূমিরাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে একই স্তরে এনেছিলেন।
৩. ভূমিরাজস্ব নিরূপণে শরীয়ত অনুমোদিত চূড়ান্ত সীমা তিনি কার্যকর করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁর রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্নের ১/২ অংশ।
৪. ভূমিরাজস্ব ধার্যের জন্য তিনি একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। এটি মূলত চাষযোগ্য ভূমির উপর চালানো হয়েছিল।
৫. তার আমলে ভূমি রাজস্ব যদিও নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে পরিশোধ করা যেত, কিন্তু তিনি শস্যের মাধ্যমে আদায়ের প্রতিই জোর দিয়েছিলেন বেশি।

আলাউদ্দিন খলজি ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে কঠোরভাবে খবরদারি চালু করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। তিনি ভূমি রাজস্ব ধার্যের ব্যাপারে এতই কঠোর প্রকৃতির ছিলেন যে, এ বিষয়ে তার আগে পরের তুলনা তিনি নিজেই।

আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী মুসলিম সুলতানদের আমল থেকেই সাম্রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ধরণের ভূমিস্বত্বের প্রচলন ছিল। এ সকল ভূমি মালিকের সংশ্লিষ্ট ভূমিতে কোন মালিকানা স্বত্ব ছিল না, তবে এক ধরনের ভোগ-দখলাধিকার থাকত।

আলাউদ্দিন খলজি শুধু ভূমি রাজস্ব বাড়িয়েই থেমে যাননি, তিনি এক সঙ্গে সরেজমিনে ভূমি পরিমাপের ব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন

'মাসাহাত'।[৬] সঠিকভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য ভূমি জরিপের প্রেরণা তিনি সম্ভবত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. থেকে লাভ করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম উমর রা.-এর রাজত্বকালেই ভূমি জারিপ করা হয়[৭] এবং পরে তা মুসলিম জাহানের অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়। তবে ভারতে আলাউদ্দিন খলজিই প্রথম মুসলমান শাসক যিনি তার সাম্রাজ্যে সরেজমিনে পরিমাপের কাজ চালু করেছিলেন। তিনি এটি যাতে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত ও গৃহিত হয় সে বিষয়েও জোর দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে ভূমিকরের পাশাপাশি 'ঘরি' বা গৃহ-কর (Home tax) 'চরাই' বা গো-চারণ (Grazing tax) প্রভৃতি আদায় করা হতো।[৮] উল্লেখ্য যে, এ সময়ে ভূমিকর দু'ভাবে পরিশোধ করা যেত–নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে। তবে তিনি অর্থের পরিবর্তে শস্যে কর আদায়েই অধিক উৎসাহী ছিলেন। কেননা আলাউদ্দিনের ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার বিশেষ করে বাজারে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ তথা দীর্ঘকালীন স্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন স্থানে পূর্বের তুলনায় অধিক হারে শস্যাগার নির্মাণ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়।[৯]

দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে কর্মচারীদের সামান্যতম ফাঁকি বা অবহেলা ধরা পড়লে আলাউদ্দিন খলজি তাদের কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। তবে তিনি তাদেরকে শুধু শাস্তিদানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং কর্মচারীরা যেন স্বল্প বেতনের অজুহাতে বা নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় কোনরূপ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে না নেয় তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজস্ব বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রয়োজন অনুপাতে বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চূড়ান্ত বিচারে বলা যায়, আলাউদ্দিনের গৃহিত ব্যবস্থায় কেন্দ্রিয় রাজকোষের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক (১৩২০-১৩২৫)

আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর দিল্লির খলজি শাসন মাত্র বছর পাঁচেক স্থায়ী হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ে তার পুত্র সুলতান কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩১৬-১৩২০) ক্ষমতাসীন থাকলেও তার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে দিল্লি শাসনের অধিকার খলজিদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের এই প্রতিকূলতার সময়ে সামান্য সীমান্ত শাসক থেকে দিল্লীর মসনদের সর্বময় কর্তার পদে আরোহণ করেছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক; প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিল্লি সালতানাতের আর এক উল্লেখযোগ্য রাজবংশ-তুগলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)।[১০] তার শাসন আমলে অনুসৃত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. সুলতান ভূমিরাজস্বের হার উৎপন্নের অর্ধেক থেকে কমিয়ে প্রজাসাধারণের সহনশীল ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন করেছিলেন, তবে এই হার কত ছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না;
২. তিনি উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানের একক ব্যবস্থা চালু করেন;
৩. 'জমা' নির্ধারণে ভূমি জরিপের প্রচলিত ব্যবস্থা শিথিল;
৪. ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক শ্রেণী হিসেবে 'খুট'[১০] 'মুকাদ্দমা'[১২] 'চৌধুরী'[১৩] প্রভৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক হৃত অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে দেন এবং
৫. ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের উপর থেকে আলাউদ্দিন খলজির সময়কার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কড়াকড়ি প্রত্যাহার করে নেন।[১৪]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক সিংহাসনে আরোহণের পর ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যে সংস্কার কাজটি সর্বপ্রথম করেন তা হল ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার কমানো। এ সম্পর্কে তবকাত-ই-আকবরীর লেখক ঐতিহাসিক খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ বলেন, 'শাসনকার্যের ব্যাপারে তিনি সংযমের সাথে কাজ করতেন এবং সর্বপ্রকার চরমপন্থা পরিহার করে চলতেন।[১৫]

ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে সংযমী পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন ভূমিরাজস্বের হার কী পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন কোন সূত্র হতেই তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[১৬] ফলত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাই বিভিন্ন হারের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির একটি মত উল্লেখযোগ্য। তার মতে, "সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল $\frac{১}{১০}$ অংশ।[১৭]

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, ড.রাধারমণ মুখার্জী প্রমুখ এই মত সমর্থন করেছেন। ড.রাধারমণ মুখার্জী বলেন, "Never before in the history of the Country was land revenue assessed at such a low scale."[১৮]

ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশির মতে সুলতান প্রচলিত ভূমিরাজস্বের হারকে পুরোপুরি পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। তার ভাষায়, "Ghiyathu'ddin Tughluq, who took a more liberal view of agrarian problems, reversed the order."[১৯]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তার স্বল্পকালীন শাসনকালে ভূমিরাজস্ব ধার্যের বেলায় যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, Moreland-এর ভাষায় তা হলো, "He discareded Measurement in favour of sharing."[২০]

ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের নিম্নস্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি খুট ও মুকাদ্দাম, চৌধুরীদের তাদের হৃত অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি খুট, মুকাদ্দাম প্রভৃতিকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রত্যর্পণ

করলেও এর একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বাবদ যে পরিমাণ অর্থ তারা কেন্দ্রিয় সরকারকে দিতে বাধ্য ছিল ঠিক ততটুকুই তারা রায়তদের কাছ থেকে আদায়ের অধিকারী ছিল।[২১] সুলতান শুধু রাজস্ব আদায়ের ফরমান জারি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সাথে সাথে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরও তাদের উপর প্রয়োজনীয় খবরদারী চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।–The Governors were to take measure to prevent them from levying any additional revenue from the peasants.[২২] এতদসত্ত্বেও কেউ অতিরিক্ত কর আদায় করলে তিনি তা বাতিল করে দিতেন। নিযামউদ্দিন বলেন, 'যদি কেউ তার জায়গির হতে বলপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ আদায় করতেন, তবে সুলতান তাতে আপত্তি করতেন এবং ঐ আদান-প্রদান বাতিল করে দিতেন। কোন লোক এই অর্থ (রাজস্ব সংক্রান্ত যে কোন পাওনা) ফেরত দিতে বিলম্ব করলে সে তাঁর ক্রোধ এবং কঠোরতার ফল ভোগ করতো"।[২৩]

সার্বিক বিচারে বলা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের গৃহিত ব্যবস্থা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা রাজস্বদাতা রায়তশ্রেণী ও রাজস্ব সংগ্রাহক ক্ষুদ্রতর শক্তি বিশেষত মধ্যস্বত্বভোগী-এই উভয়কূলের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিল। এতে একদিকে রাজকোষের আয় কমে গিয়েছিল সত্য কিন্তু অন্যদিকে সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের জনমন্ডলীর মধ্যে সুলতানের গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আলাউদ্দিন খলজির যুগে তার কঠোর নজরদারি ও নির্মম শাস্তির ভয়ে ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হতো। কিন্তু সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি কর্মচারীদের মানবিক দোষ-ত্রুটির জন্য অনেকটা নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সুলতান একেবারে লাগাম ছেড়ে দিয়ে এদেরকে যা খুশি করতে দিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের শাসনকাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রজাকল্যাণ ও একটি শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য শাসন।

সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক (১৩২৫-১৩৫১)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তদীয় পুত্র সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক। তিনি প্রথম কয়েক বছর শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করেন। পরবর্তীতে এতো বেশি নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও যুদ্ধবিগ্রহ-বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন জনকল্যাণধর্মী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তিনি তার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

জন্য পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের পরিবর্তে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির ভূমিরাজস্বনীতি অবলম্বন করেন। তাই ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার বৃদ্ধি করে উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{২}$ অংশ বা প্রায় সমপরিমাণ করার ঘোষণা দেন। কিন্তু নানা কারণে তার সে পদক্ষেপ ফলপ্রসু হয়নি। সুলতান দোয়াবর (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ) গ্রামগুলোতে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে গুজরাট, মালব, দাক্ষিণাত্য, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।[২৪]

মুহম্মদ ইবনে তুগলকের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় কীর্তি হল, গরীব রায়তদের মধ্যে আবাদপূর্ব ঋণদান প্রবর্তন। 'তাকাবি' নামে এ পদ্ধতি পূর্বেও ছিল। কিন্তু ইতঃপূর্বে তা প্রদান করা হতো যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রোপিত শস্যের ক্ষতি হলে সরকারিভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। অন্যদিকে মুহম্মদ ইবনে তুগলক এই নতুন ধরনের 'তাকাবি' চালু করেন গরীব রায়তদের তাদের অল্পস্বল্প স্থিত ভূমি ও অনাবাদি এলাকা চাষের আওতায় আনার উৎসাহ প্রদানের লক্ষে। কাজেই বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই এ প্রক্রিয়ার আবাদপূর্ব ঋণ প্রথার পথিকৃত। ড. ইরফান হাবীব বলেন, "In recorded history Muhammad Tughlaq is the first Indian ruler to have used this device to promote cultivation on a large scale."[25]

সম্রাট আলাউদ্দিনের চরিত্রের কাঠিন্য, শাস্তি কার্যকরকরণে দৃঢ়তা, যে কোন নীতি বাস্তবায়নে আপোসহীন মনোভাব সর্বোপরি তুলনাহীন নজরদারি গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মধ্যে প্রবলভাবে না থাকলেও রাজস্ব আদায়ে তার দমন-পীড়নমূলক নীতির কারণে সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল বিশেষ করে দোয়াব জনমানবহীন হয়ে পড়েছিল। জিয়াউদ্দিন বারানির ভাষায়, "দোয়াবের শহর ও গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষিকাজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়।"[২৬]

সুলতানের আমলে প্রায় সারা বছরই দুর্ভিক্ষ-খরা-অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগে থাকতো। ফলে শস্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতাও হ্রাস পায় এবং সার্বিক অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।[২৭] সুলতান এই ঘোর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে অসহায় লোকদের উদ্ধার করার জন্য এক উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রথমত তিনি রায়তদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারীভাবে ঋণ ('সোন্দার' নামে পরিচিত ছিল) প্রদান চালু করেন যা ভূমিতে শস্য রোপণের পূর্বেই দেয়া হতো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সামস-ই-সিরাজ আফিফের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সুলতান এজন্য প্রায় দু'কোটি তঙ্কা খরচ করেছিলেন যদিও সেটা তার জীবদ্দশায় আর ফেরত পাওয়া

যায়নি। পরবর্তী শাসক সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক এটি আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় বলে তা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেন।[২৮]

দ্বিতীয়ত চাষাবাদের উন্নয়ন ও কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তিনি নতুন একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত এ রাজস্ব বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দিওয়ান-ই-অমির-ই-কোই'[২৯] এর মুখ্য কাজ ছিল, to supervise his (Sultan's) attempt of bringing the uncultivated land under the plough by means of direct state management and financial support.[30] সুলতান সম্ভাব্য সকল উপায়ে দোয়াবের কৃষকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন। সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলক আলাউদ্দিনের আমলের মত 'ইক্তাদারি' প্রথাও চালু রেখেছিলেন। তবে পূর্ববর্তী শাসকের সময়ে এটি যতটা সীমিত ছিল, তার সময়ে ততটাই সম্প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি অব্যাহত ছিল 'ইজারা' ব্যবস্থা।[৩১] পরিশেষে আমরা মুহম্মদ ইবনে তুগলকের আমলে অনুসৃত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ভূমি রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে কোন সরকারের যে কোন মহৎ পরিকল্পনা ও সৎ উদ্যোগ, তা যতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ব্যয়বহুলই হোক না কেন, যদি সময়োপযোগী এবং জনসাধারণের সমর্থন বা আনুকূল্য না পায়, তবে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক এমন এক সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন যখন সাম্রাজ্যব্যাপী প্রবল বিশৃংখলা, রাজকোষোর শোচনীয় অবস্থা এবং কেন্দ্রিয় সরকারের তথা পূর্ববর্তী সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলকের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব নীতির প্রতি জনসাধারণের অত্যধিক বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ দিল্লীর সালতানাতকে প্রায় টলটলায়মান অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। নবীন সুলতান সকল বাধা উপেক্ষা করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে তার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত যে সব ব্যবস্থা বা নীতি অনুসরণ করেছিলেন নিচে তা আলোচনা করা হলো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক ভূমি রাজস্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও সর্বস্তরের জনমন্ডলী বিশেষ করে ভূমির মালিক ও কৃষকদের মনোভাব জানার জন্য খাজা হুসামউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশের এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বপ্রথম কমিশন ছিল। কমিশন দীর্ঘ ৬ বছররব্যপী প্রায় সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ শেষে স্থানীয় তথ্য-পরিসংখ্যান ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট তৈরি করেন তাতে ভূমি রাজস্ব বাবদ মোটামুটি আয়

দেখানো হয় ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ তঙ্কা।[৩২] অনেকের মতে এ হিসাব সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না। ড. যামিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে এটা একটি অনুমান নির্ভর হিসাব ('a guess work')।[৩৩] কারণ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান মুহম্মদ ইবনে তুগলকের সময়ে মোটামুটি ভূমি রাজস্ব নিরূপিত হতো ভূমি জরিপের মাধ্যমে, কিন্তু এর কোন সুনির্দিষ্ট 'জমা' বা পরিমাণ সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা ও নথিপত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং খাজা হুসামউদ্দিনের পক্ষেও সমুদয় তথ্য-পরিসংখ্যান না পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে স্বীকার করতে হবে, "The fixing of a new jam was indeed a valuable work done by firoz"[৩৪] উল্লেখ্য যে, হুসামুদ্দিনের নিরূপিত উল্লিখিত 'জমা' সুলতান ফিরোজশাহের প্রায় ৪৮ বছরের শাসনকাল অবধি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।[৩৫]

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলকের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের সাধারণ হার ছিল উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৫}$ অংশ। যদিও সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থাদিতে এই আমলের ভূমিরাজস্বের সুনির্দিষ্ট হারের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, এ কারণে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক এটি $\frac{১}{১০}$ অংশ ছিল বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[৩৬] উল্লেখ্য যে, সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে উৎপাদিত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ ভূমিরাজস্ব আদায় স্বাভাবিক ছিল। আর মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত 'খারাজ' বা ভূমিরাজস্বের সর্বনিম্ন সীমা ছিল $\frac{১}{৫}$ অংশ।[৩৭]

ভূমিরাজস্ব হার নিরূপণের ক্ষেত্রে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক যেমন অপেক্ষাকৃত নমনীয় নীতি অবলম্বন করেছিলেন তেমনি তা যাতে সর্বস্তরের ভূমির মালিক, কৃষক ও জনসাধারণের ওপর প্রযোজ্য হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একক ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। অনন্য এ অর্থে যে, এ জাতীয় একক নীতি ইতঃপূর্বে হিন্দু বা মুসলিম শাসনামলে আর কোন শাসক অনুসরণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। সুলতানের এই অনন্য সাধারণ নীতিটি হল ভূমিরাজস্ব প্রদানে ধর্মীয় পুরোহিতশ্রেণী তথা ব্রাহ্মণদেরও তিনি এর আওতায় এনেছিলেন। তবে এটি তাদের ওপর জিযিয়ারূপে[৩৮] চাপানো হয়েছিল।[৩৯] ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তা আদায়করণে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক এমন এক নীতি গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন আর্থ-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যার প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল প্রজার পক্ষে অনুকূল। তাই কৃষি ও ভূমিরাজস্ব নীতি প্রণয়নে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা প্রসূত পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। সুলতান ব্রাহ্মণদের উপর জিযিয়া ধার্য করেছিলেন বটে, তবে এর দ্বারা অমুসলিম বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ যে নিপীড়িত হননি তা ড. উপেন্দ্রনাথ দে-র বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, 'Women and Children below

fourteen and slaves were exempted from this tax; blindmen, cripples and lunatics paid only when they were welthy.'[৪০]

আধুনিক ঐতিহাসিকদের ধারণামতে আলোচ্য যুগে ভূমিরাজস্ব সচরাচর নগদ অর্থে গৃহিত হতো।[৪১] আবার সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলে অর্ধেক উৎপন্ন শস্যে এবং বাকী অর্ধেক নগদে প্রদানের রেওয়াজও চালু ছিল। ড. কোরেশি বলেন, ÔFiruz Shah persuaded peasants in certain areas to pay a half of the demand in cash and the other half in kind.'[৪২]

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক ছিলেন তার সময় পর্যন্ত দিল্লির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রজারঞ্জক ও জনদরদী শাসকদের শীর্ষস্থানীয়। প্রজাদের কোন অংশকেই ক্ষতিগ্রস্ত না করে তাদের উপকার করাই ছিল তার ব্রত। সুলতানের নিজের উক্তিতেই এই মহতি লক্ষ উদ্ভাসিত। তিনি বলেন, "বিপুল ধনরত্ন অপেক্ষা বন্ধুর শান্ত হৃদয় ঢের ভাল মানুষকে দুঃখে নিপতিত করার চেয়ে শূন্য কোষ আরও ভাল"।[৪৩]

সুলতান ভূমিরাজস্ব প্রশাসন যন্ত্রের চিরাচরিত দুর্নীতির দায় থেকে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনাকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ উপলক্ষে একদিকে কেন্দ্রিয় সরকারের ওপর থেকে প্রশাসনিক চাপ কমানো এবং অপরদিকে আমীর-উমরাহ্ মনঃতুষ্টি ও আস্থা অর্জনের জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে বহুসংখ্যক ছোট-বড় ইক্তায়[৪৪] বিভক্ত করেন। সেই সাথে 'ইজারা' ব্যবস্থাও চালু রাখেন।[৪৫]

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলকের কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সুদূরপ্রসারী কৃতিত্ব হলো, শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানত কৃষিকাজে পানি সরবরাহের আধার স্বরূপ খাল ও জলাশয় খনন, প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে পূর্বের মতো ঋণপ্রদান ও উন্নতমানের শস্যবীজ সরকারীভাবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার গৃহিত পদক্ষেপগুলো সমকালীন এবং আধুনিক-উভয় যুগের ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে।

ভূমিরাজস্ব ও কৃষিনীতি বাস্তবায়নে ফিরোজশাহের সর্বশেষ প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলো অঞ্চল ভিত্তিক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের শস্যবীজ বিতরণ। এই প্রকল্পের অধীনে সরকারী খামারগুলোতে পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ উৎপাদন করা হতো। পরে তা উপযোগী অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানকার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হতো।[৪৬]

পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের প্রচণ্ড এক-নায়কতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোর ভিতরে অবস্থান করেও সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গতানুগতিকতা পরিহার করে তাতে একটি নতুন জীবনী শক্তি দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্রাট শেরশাহ (১৫৩৯-১৫৪৫)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মতোই এক স্বল্পকালস্থায়ী শাসন-ঐতিহ্যের অধিকারী সম্রাট শেরশাহ। মাত্র পাঁচ বছরে রাজ্যবিস্তারের পাশাপাশি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাসহ সমগ্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যে অভূতপূর্ব বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা এবং দেশব্যাপি শান্তি ও সমৃদ্ধির চমৎকার সমন্বয় সাধন তিনি করেছিলেন, তার নজির ভারতের ইতিহাসে নেই বললেই চলে। শেরশাহের প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে প্রখ্যাত ইংরেজী ঐতিহাসিক এইচ.জে.কীনি বলেন, No Government-not even the British has shown so much wisdom as this pathan (SherShah).[৪৭] শেরশাহ ১৫৩৯ সনে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিনিধি (গভর্নর) জাহাঙ্গির কুলি বেগকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন। অত:পর ১৫৪০ সনে কনৌজের যুদ্ধে স্বয়ং হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি সমগ্র বাংলা ভূখন্ড অধিকার করতে পেরেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৪৮] অন্যদিকে ড. আবদুল করীমের মতে, চট্টগ্রাম তার অধিক্ষেত্রের বাইরে ছিল।[৪৯]

শেরশাহ বাংলাকে মোট কয়টি প্রশাসনিক ইউনিট বা অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন তার সঠিক কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক আব্বাস শেরওয়ানির সূত্রে ও আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র অনুসরণে ড. করীম ধারণা করেন, এগুলোর সংখ্যা ১৯ টির মতো হতে পারে।[৫০]

এই আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৪}$ অংশ।[৫১] অবশ্য কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক এর পরিমাণ $\frac{১}{৩}$ অংশ বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[৫২] তবে এ কথা ঠিক যে, মধ্যযুগে বিশেষ করে সুলতানী যুগের বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্যই যেহেতু পাওয়া যায় না তাই এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তেও পৌছান যায় না।[৫৩]

শেরশাহের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে গৃহীত হতো।[৫৪] তবে আলাউদ্দিনের মতো শস্যে গ্রহণেই সম্রাটের আগ্রহ বেশি ছিল। কেননা এতে করে প্রাপ্ত ফসল নিকটবর্তী সরকারী শস্যভান্ডারে মজুত করে রাখা যেতো এবং প্রয়োজনের সময়ে বিশেষত বাজারে দুর্মূল্যের দিনে নির্ধারিত তুলনামূলক কম দামে বাজারে ছেড়ে অর্থনীতির বিরূপ প্রক্রিয়া দ্রুত রোধ করা সম্ভব হতো। অবশ্য বাংলার ক্ষেত্রে ফসলের

পরিবর্তে নগদ অর্থেই ভূমিরাজস্ব গ্রহণে শাসককুল সচেষ্ট ছিলেন। শেরশাহও এ ধারা অব্যাহত রাখেন।[৫৫]

শেরশাহ প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে শস্য হানি বা কম হলে সেজন্য আনুপাতিক হারে সম্পূর্ণ ভূমি রাজস্ব মওকুফ করে দিতেন। এ ছাড়া খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিতে ক্রমাগত কয়েক বছর ফসল উৎপাদন সম্ভব না হলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রচলিত ঋণদান প্রথা অব্যাহত রাখেন।[৫৬]

শেরশাহ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মী-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও কিছুটা গুণগত পরিবর্তন এনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো যেমন অতিরিক্ত কঠোর ও দয়ামায়াহীন প্রকৃতির ছিলেন না, তেমনি সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারীও ছিলেন না। বরং বলা যায়, এ দুই জনের মনমানসিকতার মাঝখানে ছিল তার অবস্থান। তার আমলে রাজস্ব প্রশাসনে কর্মরত আমলা ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ দু' বছরের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি করা হতো। এটি অনেকটা অবধারিত পরম্পরা বা রুটিন-বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিল।[৫৭] এই সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারী সম্রাটের কোন আদেশ-নিষেধের পরিপন্থি কোন কাজ করলে, বিশেষ করে রায়তদের স্বার্থবিরোধী ও উৎপীড়নধর্মী কোন ভূমিকা রাখলে, তিনি তাকে বা তাদেরকে শুধু আকস্মিকভাবে বদলিই করতেন না, বরঞ্চ ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন শাস্তি দিতেও কার্পণ্য করতেন না। এ সকল ক্ষেত্রে তার প্রদত্ত শাস্তি হতো মূলত দৃষ্টান্তমূলক। ড. বিদ্যাধর মহাজন বলেন, "The object of punishment was not to reform the criminal but to set an example so that the others may not do the same."[৫৮] স্বভাবতই নিয়মিত ও আকস্মিক বদলির হুমকি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের চিরাচরিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল।

মোটকথা, শেরশাহের কৃতিত্ব এখানেই যে, যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেটিই ভারত ইতিহাসের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বে সম্রাট আকবরের কাছে পাথেয় রূপে পরিগণিত হয়েছিল। Moreland এর ভাষায় বলা যায়, The historical importance of Sher Shah's methods lies in the fact that they formed the starting point of the series of experiments in administration which marked the first half of akbar's reign.[৫৯]

বাংলাদেশ আমলের ভূমি আইন

পাকিস্তান আমলে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হলেও পরিবার প্রতি ১০০ বিঘার পরিবর্তে ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখার সীমা নির্দিষ্ট করায়

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও দেশে জোতদারি প্রথা জেঁকে বসে। তাছাড়া দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে ও অর্থনৈতিক কারণে অনেক চাষী জমি হারিয়ে প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। অনেক চাষির চাষের জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ভূমিহীন কৃষকের পক্ষে বসতবাড়ির এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে তার বসত বাড়ি ও সামান্য চাষের জমির খাজনা দেয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর থেকে প্রান্তিক ও ক্ষুদে চাষি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জমির খাজনা মওকুফ বা বাতিল করার দাবি ওঠতে থাকে। তখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হলে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছিল।[৬০]

ভূমি হুকুম দখল আইন ১৯৮৪ এবং (জরুরী) সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন ১৯৪৮ বাতিলের পর সরকার ১৯৮২ সালে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অর্ডিন্যান্স জারি করে। ভূমি সংস্কার অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪-এর মাধ্যমে বর্গাদার ও জমির মালিককে বীজ, সার ও সেচের খরচ সমানভাবে বহন করার এবং উৎপাদিত ফসলও সমানভাগে ভাগ করার বিধান দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে জমির মালিক যদি এ ধরনের খরচ বহনে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে বর্গাদারকে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের নির্দেশ দেয়। এই আইন কোন পরিবারকে ক্রয়, উত্তরাধিকার দান বা অন্য সূত্র থেকে ৬০ বিঘা পর্যন্ত জমি অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেয়। অন্যের নামে বা বেনামে কৃষিজমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয় এবং আপাত হস্তান্তরকারীকে ঐ জমির প্রকৃত মালিক হিসেবে বিবেচনার বিধান চালু করা হয়।

১৯৮৯ সালে ভূমি রাজস্ব বোর্ড দু'ভাগে ভাগ করা হয়: ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং ভূমি আপিল বোর্ড। ভূমি সংস্কার বোর্ডকে তত্ত্বাবধান ও সকল রাজস্ব কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয় আর ভূমি আপিল বোর্ডের দায়িত্ব হয় বিচার বিভাগীয় বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি বিধান করা এবং ভূমি আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা।[৬১]

২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফের বিধান

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং ঐ তারিখের সকল আইন চালু রাখা কার্যকরকরণ আদেশ দ্বারা উক্ত ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে বাংলাদেশে বলবৎ সকল আইনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে চালু রাখার বিধান করা হয়। এর ফলে ভূমি সংক্রান্ত পাকিস্তান আমলের সকল আইনই দেশে চালু থাকে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার অঙ্গীকার

রক্ষার্থে আওয়ামীলীগ সরকার রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৯৬নং আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে অষ্টাদশ 'খ' অধ্যায় এবং উক্ত অধ্যায়ের ১৫১ 'গ' থেকে ১৫১ 'ঞ' ধারাসমূহ সংযোজন করে ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির খাজনা মওকুফ করেছিল। এর ফলে যে পরিবারের সদস্যদের অধিকারভূক্ত কৃষি জমির পরিমাণ ২৫ বিঘার অনূর্ধ্ব ছিল সে পরিবারের খাজনা ১৩৭৯ বাংলা সনের ১ বৈশাখ তারিখ থেকে বা যে তারিখে জমির পরিমাণ কমার ফলে খাজনা মওকুফ পাওয়ার অধিকারী হয় সে তারিখ থেকে সে পরিবারের খাজনা মওকুফ করা হয়েছিল। তবে শর্ত ছিল যে, ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর যে পরিবারের অধিকারে ২৫ বিঘার উর্ধ্বে জমি ছিল হস্তান্তরের কারণে ঐ তারিখের পরে ঐ জমির পরিমাণ কমে ২৫ বিঘার অনূর্ধ্ব হলেও ঐ পরিবারের খাজনা মওকুফ করা হবে না। কিন্তু খাজনা মওকুফ করা হলেও ২৫ বিঘার অনূর্ধ্ব জমির মালিকদের অন্যান্য করাদি মওকুফ করা হয়নি।

১০০ বিঘার উর্ধ্বে জমি অধিকারে রাখা নিষিদ্ধকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যুদ্ধবিধ্বস্ত নতুন দেশের আর্থ-সামাজিক ও অসংগঠিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হলেও আইয়ুব প্রবর্তিত ৩৭৫ বিঘার উর্ধ্বসীমা বাতিল করে রাষ্ট্রপতির আদেশ মূলে এক লাফে ১০০ বিঘায় পুনর্স্থিরকরণ ছিল নিঃসন্দেহে খুব সাহসী একটি পদক্ষেপ। ১৫ আগষ্ট ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা (Part III A)-তে প্রকাশিত President's Order No.98 of 1972' 'বলে' The Bangladesh land Holding (Limitation) Order, 1972' নামে যে আইন (সাধারণত P.O. 94 of 1972 হিসেবে পরিচিত) ঘোষিত হয়েছিল, তার ৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল।[৬২]

Notwithstanding anything to the contrary in any other law for the time being in force,--

(ধ) No family (পরবর্তীকালে সংযোজিত 'or body') shall be entitled to retain any land held by it in excess of **one hundred standard bighas** in the aggregate and all lands held by it in excess of that quantity shall be surrendered to the Government; and

(ন) no family (পরবর্তীকালে সংযোজিত Ôor body') shall be entitled to acquire any land by purchase, inheritance, gift, *heba,* or otherwise which added to the land already held by it exceeds one hundred standard bighas in the aggregate.'

মোটকথা, কোন পরিবার ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, কোনভাবেই তাদের মালিকানায় ও ভোগদখলে সাধারণত একশত মান বিঘার বেশি ভূমি রাখতে পারবে না, এমনকি তা

ক্রয়, উত্তরাধিকার, দান বা হেবা বা অন্য কোন সূত্রে বা পন্থায় অর্জন করতে পারবে না।

তবে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বরাবরের মতো এই আইনেও কিছু ছাড় দেয়া হয়েছিল। মূল 'জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর আদলে এখানেও বলা হয়েছে যে, একান্তই ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে (কিন্তু কোন ভাবেই এর দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষ উপকৃত হতে পারবে না) যে ভূমি বা ভূখন্ড কোন ওয়াক্‌ফ, দেবোত্তর বা অন্য কোন ধর্মীয় বা দাতব্য ট্রাষ্ট বা অছি কর্তৃক সংরক্ষণ হয় বা হবে, সে ক্ষেত্রে ভূমি ভোগাধিকারের এই উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ এগুলো প্রচলিত একশত মান বিঘার অধিক ভূমি ভোগ করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ৩)। একইভাবে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের খামার, চা, রাবার ও কফি চাষের বাগানভূমি কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভূমি এবং জনস্বার্থে ব্যবহার্য অন্য যে কোন প্রকারের ভূমি ভোগাধিকারের উর্ধ্বসীমা শিথিল করা হয়েছিল (অনুচ্ছেদ ৪)।

আইনের ১৩-সংখ্যক অনুচ্ছেদে ক্ষতিপূরণের হার ছিল নিম্নরূপ[৬৩]

	প্রত্যর্পিত বা ন্যস্ত ভূমির পরিমাণ	ক্ষতিপূরণের হার
ক	যে ক্ষেত্রে সমর্পিত বা ন্যস্ত ভূমির মোট পরিমাণ ৫০ মান বিঘার কম --	সংশ্লিষ্ট ভূমির প্রচলিত বাজার দরের ২০%
খ	৫০ মান বিঘার বেশি হলে প্রথম ৫০ মান বিঘার জন্য --	সংশ্লিষ্ট ভূমির প্রচলিত বাজার দরের ২০%
গ	প্রথম ৫০ মান বিঘার পরবর্তী অবশিষ্ট সকল ভূমির জন্য	সংশ্লিষ্ট ভূমির প্রচলিত বাজার দরের ১০%

তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের বিষয়ে বিধান করা হয়েছিল (অনুচ্ছেদ ১৪) -- The amount of compensation assessed as payable to a family [or body] under articale 13 shall be paid to cash up to ten thousand taka and the balance, if any, shall be paid in savings certificates.

সিকস্তি ও পয়স্তি জমি সংক্রান্ত বিধান সংশোধন

রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৭২ নং এবং ১৩৭ নং আদেশদ্বয় দ্বারা নদী বা সমুদ্রের জল সরে গিয়ে জেগে উঠা পয়স্তি জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারা সংশোধন করে পয়স্তি জমি সংক্রান্ত বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে নদী বা সমুদ্রের জল সরে গিয়ে জমি পয়স্তি হলে ঐ জমি যে জোতের বা প্রজা স্বত্বের সাথে যুক্ত হয়েছে তাকে সে জোত বা প্রজা স্বত্বের বৃদ্ধি জমি হিসাবে গণ্য না করে তা সরকারে ন্যস্ত করার ও সরকারের অধিকারভুক্ত হওয়ার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু

১৯৭২ সালের ২৮ জুনের পূর্বে পয়স্তি প্রাপ্ত তদ্রূপ জমি সম্পর্কে উপরোক্ত বিধান কার্যকর করা হবে না যদি ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখের পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃক ঐ জমি কোনো মালিকের জোতের বৃদ্ধি জমি হিসাবে অধিকার করার স্বত্ব চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তা ঘোষিত হয়ে থকে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে উক্তরূপ পয়স্তি জমির দাবি সংক্রান্ত কোনো মামলা, দরখাস্ত, আপিল বা অন্য কোনো প্রকার কার্যধারা কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন থাকলে তা খারিজ করে দেওয়ার এবং ঐ তারিখের পর তদ্রূপ কোনো মামলা, দরখাস্ত বা অন্য কোনো প্রকার কার্যধারা কোনো আদালত কর্তৃক বিচারের জন্য গ্রহণ না করার বিধান করা হয়েছিল। ১৯৯১ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত সিকস্তি জমি সংক্রান্ত বিধান বাতিল করে দিয়ে পাকিস্তান আমলের সাবেক বিধানের প্রায় অনুরূপ বিধান করা হয়েছিল। উক্ত অধ্যাদেশ জারির দু'মাস পরে ১৯৯১ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ জারি করে উক্ত ৩ নং অধ্যাদেশ রহিত করা হয় এবং উক্ত ৩ নং অধ্যাদেশ এমনভাবে রহিত বলে গণ্য করারও বিধান করা হয়েছে যেন এটা কখনো প্রণয়ন ও জারি করা হয়নি।

উপসংহার

রাজা গণেশের শাসন ব্যতীত সুলতানী শাসন আমলে বাংলায় মুসলমান শাসনকর্তা সুলতানগণই রাজ্য শাসন করেছেন। মোগল সম্রাট আকবর-পূর্ব যুগে বাংলাদেশ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, মুহম্মদ ইবনে তুগলক, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও সর্বোপরি সুলতান শেরশাহ শূরির ন্যায় অনন্য সাধারণ শাসকদের শাসন ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হতে পেরেছিল। প্রজাহিতৈষণা ও কৃষক মঙ্গলই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ ও এর দীর্ঘস্থায়িত্বের চাবিকাঠি-এই মৌল নীতির চর্চা দিল্লির সালতানাতে প্রথমবারের মতো সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় চালু হয়েছিল, শেরশাহ তাকে অব্যাহত রেখে ও আরও প্রজাকল্যাণধর্মী করে বস্তুত পরবর্তী শাসকদের জন্য তা অনেকটা অবশ্য পালনীয় করে তুলেছিলেন, যার প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। আজকের এ বাংলাদেশে যদি ভূমি ব্যবস্থায় বিরাজিত সমস্যাবলী দুরীভূত করে প্রজাবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তাহলে আমাদের এ দেশটি অচিরেই সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে।

তথ্যনির্দেশ

১. চৌধুরী, ড. আবদুল মমিন, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, পৃ. ২৩৩

২. 'খালিশা'– যে জমির রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা হয়। (এবাদুল হক, কাজী, *ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ.৩৫৪)

৩. 'জায়গির'– বাদশাহী আমলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের কাজের বিনিময়ে যে ভূসম্পত্তি নিষ্কর স্বত্বে ভোগ করতে দেওয়া হতো তাকে 'জায়গির' বলা হতো। (প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭)

৪. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, খ. ১, পৃ. ৮৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৬. Upendra Nath, Dr. Day, *The Government of the Sultanate,* Delhi : Kumar Brothers, 1972, p. 80.

৭. Ameer Ali, Syed, *A Short History of the Saracens,* London : Macmillan & Co., 1951, p. 62,

৮. Ashirbadi Lal, Dr. *Srivastava, The Sultanate of Delhi* (711-1526 A.D.) Shiva Lal Agarwala & Co. (P.) Ltd., Agra, 1962. P. 159

৯. জিয়াউদ্দিন বারানি ও ফিরিশতার সূত্রে ড. আর পি ত্রিপাঠী বলেন, "As to the system of payment , `Alauddin was not very particular about payments in cash. On the other hand he preferred payments in kind as he was anxious to see that his regulations of prices were well carried out. It is said that while enforcing his market laws he had issued an order that in the Khalsa (Crown Lands) of the Doab and Shahri Nau the share of the government be taken in kind and the grain be stored up in state granaries. (Some Aspects, p. 263

১০. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩-১০৪

১১. খুট'–প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক হিন্দু গ্রাম্য প্রধান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Harrison William Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,* Oriental Books Reprint Corporation, Delhi : 1968, Appendix C,)

১২. 'মুকাদ্দাম'–মূলত মধ্যযুগের ভূমিরাজস্ব আদায় ও তার হিসাব রক্ষণের সাথে জড়িত গ্রামের মোড়ল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড. ইরফান হাবিব, *মোগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা,* রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা : কে. পি. বাগচী, ১৯৯০, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ.৩)

১৩. 'চৌধুরী'– ভূমি রাজস্ব বিভাগের একজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড.এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* খ. ১, (অনু : মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২. পৃ,৮৪-৮৫)

১৪. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

১৫. নিযামুদ্দিন, খাজা আহমদ, *তবকাত ই আকবরী,* খ. ১, (অনু : আহমদ ফজলুর রহমান), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ.২৩০

১৬. William Harrison Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,*Op.cit, p.40

১৭. বারানি $\frac{১}{১১}$ অংশের কথাও বলেছেন। দেখুন, 'Ram Dr. Prasad Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.271.

১৮. Radha Romon, Dr. Mookerjee, *History and Incident of Occupancy Right,* Delhi : Neeraj publishing House, 1987, p.41.

১৯. Ishtiaq Husain, Dr. Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Dehli,* Dehli Oriental Books Reprint, 1971, p.107

20. Harrison Willam Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,* Op.cit, p.40

২১. 'Certainly they were not allowed to realize more form the peasantry than they were to deposit in the treasury.' (Upendra Nath Dr. day, *The Government of the Sultanate,* Op.cit, p.87)
২২. Harrison William, Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,* Op.cit, p.87.
২৩. নিযামুদ্দিন, খাজা আহমদ, *তবকাত ই আকবরী,* খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০-৩১।
২৪. Irfan, Dr. Habib, *The Cambridge Economic History of India,* Vol.I, (1200-1750), Calcatta, Orient Longman, 1993, p.63.
২৫. Ibid, P.65.
২৬. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৫,* কে,পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, পৃ.১৪৯
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
২৮. Ram Prasad, Dr. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.282
২৯. নিযামুদ্দিন, খাজা আহমদ, *তবকাত ই আকবরী,* খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩
৩০. Ram Prasad, Dr. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.278.
৩১. Ibid, p. 280-81
৩২. Ram Prasad, Dr. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.284. Moreland-এর মতে এর পরিমাণ ছিল ৫ $\frac{৩}{৪}$ কোটি তঙ্কা, (Harrison William Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,* Delhi : Oriental Books Reprint Corporation,1968, p.57); ড. যামিনী মোহন এর মতে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ (Dr. Jamini Mohan Banerjee, *History of Firoz Shah Tughluq,* Delhi : Munshiram Manoharlal, 1967, p.116)
৩৩. Jamini, Dr. Mohan Banerjee, Loc.cit
৩৪. Ram Prasad, Dr. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.284
৩৫. Quoted from, Ram Prasad Dr. Tripathi, *Some Aspects of Muslim Administration,* Op.cit, p.284.
৩৬. Radha Romon, Dr. Mookerjee, *History and Incident of Occupancy Right,* Op.cit, P.41
৩৭. Upendra Nath, Dr. Day, *The Government of the Sultanate,* Op.cit, p.85.
৩৮. জিযিয়া–আরবী শব্দ, যার অর্থ কর; মূলত ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের ওপর আরোপিত মাথাপিছু কর। এর হার মোটামুটি ৩ প্রকারের। এই আমলে 'জিজিয়া' প্রবর্তনের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট জানার জন্য দেখুন, Dr. Jamini Mohan Banerjee, *History of Firoz Shah Tughluq,* Op.cit, p.123-25.
৩৯. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬
৪০. Jamini Mohan, Dr. Banerjee, *History of Firoz Shah Tughluq,* Op.cit, P.118
৪১. Ishtiaq Husain, Dr. Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Dehli,* Op.cit, p.110
৪২. Jamini Mohan, Dr. Banerjee-Gi *History of firuzShah Tughluq'* - এ (পৃ.১২২) সুলতান-এর উক্তির অনুবাদ পাই :

'To compose the hearts of friends is better than a store of wealth.
To have empty treasure is better than draining the people to afflictiony"

৪৩. The iqta was a territorial assignment and its holder was designated muqti.(Dr. Irfan Habib, *The Cambridge Economic History of India,* Vol.I, (1200-1750), Op.cit, p.68)
৪৪. Jamini Mohan, Dr. Banerjee, *History of firuz Shah Tughluq'* Op.cit, P.115

৪৫. Loc.cit

৪৬. Quoted from Vidyadhar, Dr. Mahajan, *Mughal Rule in India*, Calcutta : S. Chand & Co, 1972, p.58.

৪৭. William Harrison Moreland, *The Agrarian System of Moslem India*, op.cit, p.74.

৪৮. আবদুর, ড. রহীম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, পৃ.২৪৪

৪৯. আবদুল, ড. করীম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৬

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

৫১. রহিম, ড. মুহম্মদ আবদুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (অনুঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), খ. ২, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ.১০৭;

৫২. Ishtiaq Husain, Dr. Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Dehli*, Op.cit, P.119

৫৩. করীম, ড. আবদুল, *বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ.৪০৬। প্রসঙ্গত ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ড. কালীকিঙ্কর দত্তের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তারা কোন সুনির্দিষ্ট হারের কথা উল্লেখ না করে শেরশাহের আমলে ভূমিরাজস্বের হার বস্তুত এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ হতে পারে বলে ধারণা করেছেন। (Dr.G.Srinivasachari, *An Advanced History of India*, New Delhi : Allied Publishers, 1970, p.440).

৫৪. Iswari, Dr. Prasad, *The Mughal Empire*, Allahabad : Chugh Pulications, 1970, p.176.

৫৫. রহিম, ড. মুহাম্মদ আব্দুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (অনুঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭

৫৬. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের-ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪২

৫৭. Vidyadhar, Dr. Mahajan, *Mughal Rule in India*, Ibid, P.53

৫৮. Ibid, p. 53

৫৯. Quoted from ` Vidyadhar, Dr. Mahajan, *Mughal Rule in India*, Ibid, P.53

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

৬১. হক, কাজী এবাদুল, *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ৭, পৃ.৩৯৮-৯৯

৬২. *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*, ১ম খ., ১৯৮৭, পৃ.১৩৪.

৬৩. *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*, ১ম খ., ১৯৮৭, পৃ. ১৩৮

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ১২৯-১৪৯

প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তারেক মোহাম্মদ জায়েদ*
শহীদুল ইসলাম**

সারসংক্ষেপ

[জীবন, সম্পদ ও সম্মানের অধিকার রক্ষাকে ইসলাম মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে গণ্য করে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে না। একটি শান্তিময় সমাজের জন্য জীবন, সম্পদ ও সম্মানের সুরক্ষাকে ইসলাম শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছে। যে সমাজে জীবন, সম্পদ ও সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত নয় সেই সমাজে কোনো অবস্থাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। ইতিহাস সাক্ষী, রসূলুল্লাহ স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ তিনটি বিষয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিলো। এগুলোতে আঘাত করার ধৃষ্টতা কেউ করলে তাকে নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। সাম্প্রতিককালে শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন হচ্ছে মানুষের মান-সম্মান। কিন্তু প্রচলিত আইন মান-সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না। এ প্রবন্ধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে মানহানির প্রতিকার ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।]

মানহানির সংগা

সাধারণত নিন্দাবাদ দ্বারা সুনাম[১] নষ্ট করা বা ক্ষুণ্ন করাকে মানহানি বলে।

বাংলাদেশ-এর দণ্ডবিধির ৪৪৯ ধারা অনুযায়ী "যে ব্যক্তি এ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে বা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুমান নষ্ট করবে। সেই ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, উক্ত ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে গণ্য হবে"।[২]

*প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
** সহকারী সম্পাদক, ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার।

৪৯৯ ধারার সারকথা : যে নিন্দাবাদ অন্য লোকের ধারণায় কোন ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সংক্রান্ত গুণাবলী হেয় করে বা উক্ত ব্যক্তির দেহকে ঘৃণাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে ঘোষণা করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে, সেই নিন্দাবাদ মানহানিকর।[৩]

দণ্ডবিধি'র ৪৯৯ নং ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

"(ক) কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন করা, বা

(খ) কোন নিন্দাবাদ প্রকাশ করা, মানহানিরূপে পরিগণিত হয় যদি–

১. উহা এইরূপ অভিপ্রায়ে করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

২. উহা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

৩. এই বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে

ক. কথার দ্বারা,

খ. পাঠের জন্য অভিপ্রেত লেখার দ্বারা,

গ. চিহ্নের দ্বারা, বা

ঘ. দৃশ্যমান কল্পমূর্তি দ্বারা।

মানহানির মূল কথা হইতেছে অন্যের সুনাম নষ্ট করা। যে নামে ডাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আহত হন এবং তাহার এই আহত হওয়ার কারণ নিন্দাবাদ, সেই নামে ডাকা মানহানিকর বলিয়া গণ্য হয়।"[৪]

১. "মৃত ব্যক্তি সম্পর্কেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি হইতে পারে যদি ঐ নিন্দাবাদ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গকে আঘাত করে বা ঐ নিন্দাবাদ মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে আঘাত করিত।

২. এক ব্যক্তিকে না করিয়া কোম্পানী, সংঘ বা সমাবেশ সম্বন্ধেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি করা যায়। তবে ঐ কোম্পানী, সংঘ বা সমাবেশ স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হইতে হইবে।

৩. বিদ্রূপাত্মকভাবেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি করা যায়।"[৫]

মানহানি কখন হয়

প্রকাশের মধ্যেই মানহানি নিহিত। সাধারণ অর্থে 'প্রকাশ' বলতে কোন কিছুর প্রচার বা সঞ্চার বুঝায়। আমি যা বলছি বা লিখছি বা আঁকছি তা সবই আমার। এগুলো যখন অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করি তখনই তা প্রকাশ পায় এবং যখন সেই কথা বা লেখা অন্যের বোধগম্য হয় তখনই তা প্রকাশিত বলে মনে করা যায়। কোন বিদেশী নাগরিক যারা বাংলা ভাষা বোঝেন না, তাদের যদি সবার সামনে অকথ্য ভাষায়

গালমন্দ করা হয় তাহলে তা মানহানিকর হবে না, কারণ তারা বুঝতেই পারেনি যে তাদের গালমন্দ করা হয়েছে।[৬]

"মানহানির অপরাধের মধ্যে প্রকাশনা অপরিহার্য। যেখানে প্রকাশনা নেই সেখানে মানহানি নেই। মনে মনে গজরাইলে তাতে কোন দোষ হয় না। এমনকি নিন্দাসূচক কিছু লিখিলেও তাহা দোষ হয় না, যদি না তাহা প্রকাশিত হয়। লিখিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলে তাহাতে কোন অপরাধ হয় না। যাহার সম্পর্কে লেখা হইয়াছে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেও এই ধারার মানহানি হয় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণের চোখে নিন্দাবাদের কারণে কোন ব্যক্তি হেয় প্রতিপন্ন না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বা লিপি মানহানি বলিয়া পরিগণিত হয় না। অন্যের মনে আক্রান্ত ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি, বর্ণ, পেশা সম্পর্কে যতক্ষণ না হেয়ভাব সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানহানি হয় না।"[৭]

নিম্নে বর্ণিত কর্মকান্ড মানহানিরূপে বিবেচ্য নয়

১. জনমঙ্গলের জন্য সত্য দোষারোপ করলে তাতে মানহানি হয় না।
২. জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে সদবিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়।
৩. যে কোন জনসমস্যা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদবিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়।
৪. আদালতসমূহের কার্যবিবরণী রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়।
৫. আদালতের সিদ্ধান্তকৃত মোকদ্দমার দোষ-গুণ বা সাক্ষীসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে সদবিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়।
৬. গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নয়।
৭. অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদবিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা মানহানির শামিল নয়।
৮. কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদবিশ্বাসে অভিযুক্ত করা মানহানির শামিল নয়।
৯. কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার বা অন্য কারোও স্বার্থ রক্ষার্থে সদবিশ্বাসে কোন দোষারোপ করা মানহানির শামিল নয়।
১০. সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে বা গণ-কল্যাণার্থে সতর্কতা মানহানির শামিল নয়।[৮]

মানহানির ক্ষেত্রসমূহ

সাধারণত পেশাকে কেন্দ্র করেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনাম বা দুর্নামের প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন ধরনের পেশার জন্য সুনামের প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেখানে দুর্নাম নেই, ধরে নিতে হবে সেখানে সুনাম আছে। কারণ আইনে অপরাধ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে 'সকল মানুষ নির্দোষ, যতক্ষণ না আইনী প্রক্রিয়ায় সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়'।[৯]

নিন্দাবাদের বিশেষ অধিকার

আইন কয়েক শ্রেণীর মানুষকে নিন্দাবাদের বিশেষ অধিকার দিয়েছে। যারা বিশেষাধিকার প্রাপ্ত নিন্দাবাদের কারণে তাদের কোন অবস্থাতেই দায়ী করা যাবে না। এই বিশেষাধিকার দু'ধরণের হতে পারে। শর্তহীন বিশেষাধিকার এবং শর্তযুক্ত বিশেষাধিকার।

শর্তহীন বিশেষাধিকার : শর্তহীন বিশেষাধিকার সংসদে প্রযোজ্য। সংসদে সদস্যবৃন্দ যে সব আলাপ আলোচনা করেন সেসব আলাপ আলোচনার মধ্যে যত নিন্দাবাদ থাকুক না কেন, সেগুলোর প্রকাশে ও প্রচারে কোনও বাধা নিষেধ নেই। সংসদে যেসব কথাবার্তা হয় সেইসব কথাবার্তার জন্য কোথাও জবাবদিহি করতে হবে এমন আশংকা সংসদ সদস্যদের মনে উদয় হলে স্বাধীন আলোচনার পথ ব্যহত হবে। সংসদ হচ্ছে এমন একটি সংস্থা যেখানে সকল সদস্যের বাকস্বাধীনতা নিরংকুশ থাকা উচিত। সেখানে কোনও সদস্য যদি মিথ্যা কথা বলেন, প্রতারণামূলক কথা বলেন, তবুও সেই অন্যায়ের জন্য কোনও আদালত তাকে শাস্তি দিতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে এই নিরাপত্তা এবং বিশেষাধিকার অন্যায্য মনে হতে পারে, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা আবশ্যক। দেশের সার্বভৌম শক্তির আধার যে সংস্থা, সেই সংস্থায় কোনও কিছু বলার সময় বা লিখার সময় যদি বক্তার বা লেখকের মনে ক্ষীণতম ভীতি প্রশ্রয় পায়, তবে তাদের পরামর্শ বা উপদেশ পূর্ণভাবে সঠিক হওয়ার পথ খুঁজে পায় না।[১০]

শর্তযুক্ত বিশেষাধিকার : বিচার চলাকালে বিচারক, বিচারের পক্ষবৃন্দ, সাক্ষী এবং এডভোকেটগণ সীমিত বা শর্তযুক্ত বিশেষাধিকার ভোগ করেন। বিচারক মুখে কিংবা লিখিতভাবে যা কিছু বলেন, তা যতই নিন্দামূলক হোক না কেন, সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের বিদ্বেষমুক্ত হতে হবে। মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদও মানহানিকর হবে যদি তার আত্মীয় স্বজনের অনুভূতিকে তা আঘাত করে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ জীবনী রচনার উদ্দেশ্যে বা ইতিহাসকে সত্যাশ্রয়ী করার জন্য

অনেক সময় মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর উক্তি পরিবেশনের প্রয়োজন পড়ে। এগুলোকে মানহানিকর বলা যায় না।[১১]

প্রচলিত আইনে মানহানির প্রতিকার

ক্ষুব্ধ ব্যক্তির 'মান' এর মূল্য নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নেই। কুৎসার তীব্রতা, পৌণপুণিকতা, বাদীর খ্যাতি, পরিচিতি, পেশাগত মর্যাদা, ব্যবসার পরিধি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের নিকট আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাইতে অথবা দোষী ব্যক্তির শাস্তি দাবি করতে পারেন।
প্রচলিত আইনে মানহানির দুই ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে–
ক. দেওয়ানী প্রতিকার
খ. ফৌজদারী প্রতিকার

ক. দেওয়ানী প্রতিকার

দেওয়ানী আদালতে মানহানির জন্য দুই প্রকার মামলা করা যায়–
১. মানহানিকর কিছু যেন প্রকাশিত না হয়, সে জন্য ইনজাংকশনের (Injunction) মামলা করা যায়। দেওয়ানী আদালত হতে ইনজাংকশন পাওয়ার জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। তা হলো যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তা অসত্য এবং তা প্রকাশ পেলে বাদীর অপূরণীয় ক্ষতি হবে।
২. পত্রিকায় মানহানিকর কিছু প্রকাশিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। যিনি মানহানিকর প্রকাশনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তিনি তার মর্যাদা অনুসারে এবং কুৎসার ভয়াবহতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। মানহানিকর তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে দেওয়ানী মামলায় প্রতিকার পাওয়া যায় না।[১২]

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক মানহানির ক্ষতিপূরণ ধার্য হওয়ার নজীর

মর্নিং নিউজ নামক একটি দৈনিকে ১৯৪৯ সালের ১৭ এপ্রিল একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটি তৎকালীন পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে জড়িয়ে ভারতে স্টীল বিক্রয় করার সংবাদ ছাপায়। যেহেতু তখন ভারতকে পাকিস্তানের শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা হতো তাই ভারতে রড বিক্রি করা একটি দেশপ্রেম বিরোধী কাজ। এই সংবাদ মুদ্রণ করার ফলে মন্ত্রীর সুনাম ক্ষুণ্ন হয় বলে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার মানহানির দরুণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিতে ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করেন। অতঃপর বিচার প্রক্রিয়া শেষে বিজ্ঞ আদালত ১৯৫৩ সালের ১২ মার্চ বিবাদীর বিরুদ্ধে (তৎকালীন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর অনুকূলে) ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ

প্রদানের আদেশ দেন। বিবাদী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করেন। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আপীল শুনানী শেষে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদানের আদেশ কমিয়ে তদস্থলে ১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত) টাকা ধার্য করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন।[১২ক]

খ. ফৌজদারী প্রতিকার

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মানহানি করে সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে- যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১৩] এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হবে-

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করেছিলেন।

২. তা মানহানির শামিল ছিল।

৩. তিনি তা মানহানিকর বলে জানতেন বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল।[১৪]

মানহানির বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয়করণ

দণ্ডবিধির ৫০২ নং ধারায় বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি মানহানির বিষয় সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু উহা অনুরূপ বিষয়সম্বলিত বলে জেনেও বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

প্রমাণ পদ্ধতি

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয়-

১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বিষয় বিক্রয় করেছিলেন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

২) উহা মানহানির শামিল ছিল।

৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাকে মানহানিকর বলে জানতেন।"[১৪/ক]

নিষ্পত্তিকৃত কতিপয় মানহানি মামলার বিবরণ দেখার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রসমূহ দেখা যেতে পারে

১. ড. জামশেদ বখত বনাম আমীনুর রশীদ চৌধুরী: বিএলডি ১ (১৯৮১)- এপিলেট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ৩১৪; বিসিআর ১ (১৯৮১)- এপিলেট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ২৩৬; ডি এল আর ৩৩ (১৯৮১)- এপিলেট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ৩৩৩; বি এস সি আর ৪ (১৯৮১)- এপিলেট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ৪৮৯।

২. মিসেস সিগমা হুদা বনাম ইশফাক সামাদ এবং অন্যান্য: বি এল ডি ১৩ (১৯৯৩)- হাইকোর্ট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ১৫২; ডিএলআর ৪৫ (১৯৯৩)- হাই কোর্ট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ১২৯।
৩. সাইয়েদ মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন বনাম এসএম সেলিম ইদ্রিস: বিএলডি ১৫ (১৯৯৫) হাইকোর্ট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ৩৬২।
৪. এম ওয়াজেদ আলী বনাম রাষ্ট্র পক্ষ এবং অন্যান্য: বিসিআর ৫ (১৯৮৫)- এপিলেট ডিভিশন- পৃষ্ঠা ২৮৫।
৫. এ কে এম জাহাঙ্গীর বনাম হাজী মুনশী মিয়া: বিএল টি ৫ (১৯৯৭)- এপিলেট ডিভিশন- ১৯৮৪।

ইসলামী আইনে মানহানি

ব্যক্তির সম্মান ও সুনাম একটি পবিত্র জিনিস। রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এই শহর পবিত্র"।[১৫] কারো গোপন তথ্য খোঁজা এবং তার ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা একজন অপরজনের গীবত (পরনিন্দা) করো না'।[১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরজনকে খারাপ উপাধিতে ভূষিত করো না।[১৭]

ইসলামী আইনে মানহানি প্রসঙ্গটিকে كذب-মিথ্যা, ظن-সত্যাসত্য যাচাই না করে কোনো কথা বলা বা অভিযোগ করা, إفتراء-মিথ্যা-রটনা বা মিথ্যা ঘটনায় সম্পৃক্ত করা, قذف-মিথ্যা অপবাদ, استهزاء-বিদ্রূপ করা, استخفاف-হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখিত আয়াতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. "যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে, এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই সত্যত্যাগী"।[১৮]
২. 'যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এদের প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[১৯]
   এই আয়াতে আন্দাজ-অনুমানে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
৩. "দুর্ভোগ তাদের প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে"।[২০]
৪. "হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে

ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়"।[২১]

৫. "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম"।[২২]

মানহানি সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর পর্যালোচনা

১. **قذف** : বা অপবাদ সংক্রান্ত আয়াতে চারজন সাক্ষী ছাড়া কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারও বলে দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতটি অপবাদ বা কারো প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপজনিত অপরাধের শাস্তি বিধানের ভিত্তি।

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং ভিত্তিহীনভাবে পৈত্রিক সম্পর্ক অস্বীকারকারীর শাস্তি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এ দুটি ছাড়া আর যত অপবাদ আছে এগুলো কযফ এর দণ্ডারোপের পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যান্য অপবাদে বিচারের আওতায় শাস্তি দেয়া যেতে পারে কিন্তু হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কযফ এর দণ্ড প্রয়োগ করার শর্ত হলো, কাযেফ (মিথ্যা আরোপকারী) প্রাপ্তবয়স্ক স্বজ্ঞান এবং যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত হওয়া। অপবাদের ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়া এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ব্যভিচারী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে মুহসিন বলা হবে, যার প্রাপ্তবয়স্ক, স্বজ্ঞান, স্বাধীন মুসলমান অবস্থায় কোন নারীর সাথে বৈধ পন্থায় বিয়ে হয়েছে এবং সেই বৈধ স্ত্রীর সাথে তার মিলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রী গমন আবশ্যক নয়, শুধু মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন এবং অন্যদের দৃষ্টিতে সৎচরিত্র হওয়াই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি কষাঘাত। কুরআনুল কারীম পরিষ্কার ভাষায় 'আশি কষাঘাত' শব্দ উল্লেখ করেছে। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে আশি কষাঘাত ছাড়াও তার আরো শাস্তি হলো, এ দণ্ডে

দণ্ডিত হলে তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ 'কখনও তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করো না' বলে কুরআনুল কারীম দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা দিয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে খুবই ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে"।

যদি মাকযুফ (যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে) কাযেফকে (অপবাদ আরোপকারী) ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. এবং অন্যান্য ফকীহদের মতে মিথ্যা অপবাদকারীকে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এই অপবাদের সংবাদ বিচারকের কাছে পৌছুক বা না পৌছুক। কোন কোন ফকীহ বলেন, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সংবাদ যদি বিচারকের কানে পৌছে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করলেও তা কার্যকর হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না। যদি বিচারক না জানেন তাহলে ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে।

এ সম্পর্কে ইমাম মালেক র. একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তার একটি অভিমত ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুরূপ। এর বিপরীতে তিনি এটাও বলেছেন, যদি এই সংবাদ বিচারক জানতে পারেন তাহলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া একথাও তিনি বলেছেন, বিচারকের জানার পরও ক্ষমা প্রযোজ্য হতে পারে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তার মান অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ব্যাপারটিকে চেপে রাখার জন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে বিচারকের কাছে আবেদন করে। এটি ইমাম মালেক র. এর সর্বশেষ ও বহুল আলোচিত মত।

মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে ক্ষমা করার বৈধতা নিয়ে সৃষ্ট মতানৈক্যের মূল উৎস হলো, কযফ তথা অপবাদ জনিত অপরাধের অবস্থানজনিত পর্যায়। এখানে মূল প্রশ্নটি হলো, অপবাদ আসলে কোন পর্যায়ভুক্ত অপরাধ?

যাঁরা বলেন, কযফ (অপবাদ) হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার), তাদের দৃষ্টিতে যেনার মত এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও অপরাধী ক্ষমা পাবে না। আর যাঁরা কযফকে হক্কুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) বলেছেন, তাদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে ক্ষমা প্রযোজ্য। আর যাঁদের কাছে কযফ একই সাথে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ বিনষ্টকারী তাদের মত হলো, যদি অপবাদ আরোপের সংবাদ বিচারক জানতে পারেন, তাহলে আর ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। আর যাদের দৃষ্টিতে অপবাদে আল্লাহ ও বান্দার হক উভয়টি রয়েছে তবে বান্দার হক প্রবল তাদের দৃষ্টিতে বিচারকের কাছে অপবাদ আরোপের সংবাদ পৌছে গেলেও ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

বস্তুত এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অপবাদকারীর অপবাদ যদি আরোপিত ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

বিশিষ্ট গবেষক ও ফকীহ্ ড. আব্দুল আযীয আমের বলেন, কযফ (মিথ্যা অপবাদ) এর ধরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি একটি মানবাধিকার (Human Right)। সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সমাজের বিশৃংখলা চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা যাতে সামাজিক জীবনে স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সমাজের কারো চরিত্রে কলংক বা অপবাদ আরোপ করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইজ্জতের উপর আঘাত করার নামান্তর। এটিকে সামাজিক অধিকার হরণের পর্যায়ভুক্ত মনে করতে হবে। এমনটি মনে করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না।[২৩]

২. إفتراء : (ইফতিরা) আভিধানিক অর্থে ইফতিরা অর্থ– মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া অসত্য বক্তব্য, অবাস্তব ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত কোন অভিযোগ বা দোষ কারো উপর আরোপ করা।[২৪]

ইসলামী পরিভাষায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানানো প্রচারণাকে ইফতিরা বলা হয়।

আল্লামা রাগেব ইসফাহানী তাঁর মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইফতিরা (বানানো মিথ্যা) আর কিয্ব (নিরেট মিথ্যা)-র মধ্যে পার্থক্য হলো, মিথ্যা কখনো কল্যাণকরও হতে পারে এবং বৃহত্তর কল্যাণে মিথ্যা প্রয়োগের অবকাশ আছে। যেমন বিবদমান দু'টি পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও বিবাদ নিরসনে কোন মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজনে অসত্য তথা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, তা অপরাধ হবে না। কিন্তু ইফতিরা এমন মিথ্যা, যা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তৈরি করা হয়, বানানো হয় শুধুই অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, যাতে কল্যাণের কোনই অবকাশ নেই।[২৫]

ইফতিরা প্রসঙ্গে সূরা ইউনুস-এর ৩৮, ৬৯, সূরা মুমতাহিনা-এর ১২ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় আরো বিশদ দেখা যেতে পারে।

তাবসারাতুল হুক্কাম গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অসত্য অভিযোগ করে কিংবা প্রচারণা চালায়, আর প্রচারণায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রচারণাকারীর বিরুদ্ধে অসত্যের অভিযোগ করে এবং প্রচারণাকারী তার প্রচারণার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে প্রমাণ না করতে পারে তবে মিথ্যা প্রচারণায় অন্যের ক্ষতি করার অপরাধে সে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২৬]

কেউ যদি কাউকে অপমান করার জন্যে মনগড়া গল্প তৈরি করে অথবা কোন বানানো গল্প ছড়িয়ে দেয় সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ ও ফিরিশতা ও মানুষ সবার অভিশাপ বর্ষিত হয়।[২৭]

৩. عِرْض : (ইরদ্) মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি শব্দ عرض (ইরদ্) অর্থ– সম্মান, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, বংশমর্যাদা, খ্যাতি, যশ ইত্যাদি। ইরদ শব্দ দ্বারা সার্বিক সম্মানকেও বোঝায়। ইরদ শব্দটি যদি জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তখন এর অর্থ দাঁড়ায় সুখ্যাতি।[২৮]

৪. همزة ও لمزة : (হুমাযাহ ও লুমাযাহ) মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ। শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। যদিও কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন কিন্তু সার্বিক অর্থে শব্দ দুটি কাউকে অসম্মান, লাঞ্ছিত, হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অপমান করা বোঝায়। ইমাম তাবারী র. বলেন, اللمز আল্ লুময়ু- হাত, চোখ, মুখ ও ইশারা দ্বারা সংঘটিত হয়। আর الهمز আল হুময়ু - মুখ বা যবান দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।[২৯] কারো প্রতি বিরূপ অঙ্গভঙ্গি করে তাকে হেয় করা, কোন কাজ কর্ম দিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে কাউকে অসম্মান করা, কারো ব্যক্তিসত্তা, বংশমর্যাদাকে ভিত্তিহীন অসত্য প্রচারণা দ্বারা ক্ষুণ্ন করা, মুখোমুখি কারো বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর মন্তব্য করা, নাম বিকৃত করে খারাপ বিশেষণে অভিহিত করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম।[৩০]

৫. استخفاف: ইসতেখফাফ : শাব্দিক অর্থ কাউকে ছোট বানানো, হেয় প্রতিপন্ন করা, কারো মান ক্ষুণ্ন করা। পারিভাষিক অর্থও তাই।

ইসতিখফাফ তথা কারো মান ক্ষুণ্ন বা হেয় করা, তা কথা-কর্ম ও বিশ্বাস অনেকভাবে হতে পারে। ইসতিখফাফ সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে ১. প্রত্যাশিত ২. নিষিদ্ধ।

১. প্রত্যাশিত ইসতিখফাফ হলো, কেউ কোন গর্হিত কাজ করলে তার নিন্দা করা। যেমন কোন মুসলমান কুফরী করলো, হারাম কাজে লিপ্ত হলো, বিদআত বা ফাসেকী কাজ করলো এমতাবস্থায় সেই কাজের জন্য তার নিন্দা করা নিষিদ্ধ নয় বরং প্রত্যাশিত ও নন্দিত।[৩১]

২. নিষিদ্ধ ইসতিখফাফ

ক. মহান আল্লাহর অমর্যাদা : কোন কথা, কাজ, উক্তি ও বিশ্বাস প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হারাম। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কাজ কোন মুসলমান করলে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'এবং আপনি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে আমরা আলাপ আলোচনা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলাম। বলুন, তোমরা কি মহান আল্লাহ্, তার নিদর্শন এবং রসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?[৩২]

খ. আম্বিয়া কেরামকে হেয় করা : কোন কথা কর্ম ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে নবীদের মর্যাদাহানি করা। যেমন নবীর কাল্পনিক চিত্র অংকন, মূর্তি তৈরি, গালি দেয়া, ভিত্তিহীন কোন দুষ্কর্মের দোষারোপ করা, কুরুচি ও অমর্যাদাকর কাহিনী কোন নবীর প্রতি সম্পৃক্ত করা, নবীর মর্যাদার পরিপন্থী কোন ক্ষেত্রে নবীর উক্তি ব্যবহার করা। মোটকথা, যেভাবেই হোক না কেন, যখন মুসলিম সমাজের বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত হয় এমন যে কোন কাজই নবীর মর্যাদাহানি বলে বিবেচিত হবে। তবে এর শরয়ী ভিত্তি থাকতে হবে। নবীর মর্যাদাহানিকারী ব্যক্তি মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহ ও রসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি এদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি"।[৩৩]

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন, ফেরেশতা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কটূক্তি ও তাদের মর্যাদা পরিপন্থী যে কোন কাজ নিষিদ্ধ ও হারাম। যে কোন ভাবে উল্লেখিতদের অমর্যাদা ও মানহানি করলে সে তাযিরী শাস্তিযোগ্য হবে।[৩৪]

৬. **ظن** : মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি শব্দ হলো ظن 'যাননুন'। এর শাব্দিক অর্থ– ধারণা, সংশয়, সন্দেহ, বস্তুত যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত। এই শব্দটি কখনো অপবাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৩৫]

আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান নির্ভর ধারণা থেকে দূরে থাকো। কারণ অনুমান নির্ভর ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[৩৬]

ইবনে নুজাইম বলেন, কুরআনুল কারীমে যে জায়গায় ظن 'যাননুন' শব্দ প্রশংসনীয় ও সওয়াবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে যাননুন শব্দের অর্থ দৃঢ় অনড় অটল

ধারণা। আর যেক্ষেত্রে এ শব্দটি মন্দ, দূষণীয় ও আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ظن এর অর্থ হবে-সংশয়, সন্দেহজনক ধারণা।[৩৭]
ফকীহদের দৃষ্টিতে ظن চার প্রকার।
১. নিষিদ্ধ ২. নির্দেশিত ৩. প্রশংসনীয় ৪. বৈধ।
নিষিদ্ধ ও নির্দেশিত ধারণা : আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। বরং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা নির্দেশিত । কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তোমরা কেউ আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করো না"।[৩৮]
অনুরূপ যে মুসলমান সম্পর্কে সমাজে সুধারণা রয়েছে, সমাজে যিনি সুনাগরিক হিসেবে পরিচিত ও প্রমাণিত তার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ এবং সুধারণা পোষণ করা নির্দেশিত।
প্রশংসিত ধারণা অর্থ হলো, সাধারণত সকল মুসলমান সম্পর্কে কোন মন্দ প্রমাণ না থাকলে সুধারণা পোষণ করা। আর নামায অজু ইত্যাদিতে সংশয় দেখা দিলে সেখানে ধারণার প্রাবল্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
ফিকাহবিদ রমলী র. শাফেয়ীদের উদ্ধৃত করে বলেন, শরীয়তে ধারণা চার প্রকার। ওয়াজিব, মানদুব, হারাম, মুবাহ।

১. আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ওয়াজিব।
২. আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা মুসলমানের জন্যে হারাম। সেই সাথে সমাজে সুনাগরিক হিসাবে পরিচিত কোন মুসলমান সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম।
৩. মুসলিম সমাজে কোন ব্যক্তি যদি সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয় এবং সে নিজেও নানা গর্হিত কাজে সংশ্লিষ্ট থাকে তবে তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা মুবাহ বা বৈধ।
৪. বিচারের ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তি কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষ্য দেয়ার দ্বারা যে বিশ্বাস জন্মে তাতে আস্থা স্থাপন করা জায়েয।[৩৯]

ظن বা ধারণা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ধারণার দু'টি অবস্থা
১. মনের মধ্যে একটা ধারণা উঁকি দিলো, যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই এবং এই ধারণার বিপরীতের চেয়ে এটি মোটেও অগ্রাধিকার পাবার মতো নয়। এমতাবস্থায় সৃষ্ট ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া বা কাজ করা বৈধ নয়। এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমানভিত্তিক ধারণা থেকে দূরে থাকো"।[৪০]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুমান নির্ভর ধারণা থেকে বিরত থাকবে, কেননা অনুমান নির্ভর কথা জঘন্য মিথ্যা"।[৪১]
২. এমন ধারণা যা জ্ঞাত ও পরিচিত, যে ধারণাকে বলিষ্ঠ করার মতো প্রমাণ থাকে, তবে এমন ধারণার ভিত্তিতে কাজ করা ও সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ। কেননা ধারণার প্রাবল্যের ভিত্তিতেই শরীয়তের অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ইমাম নববী এবং খাত্তাবী বলেন, ধারণার ভিত্তিতে কোন কাজ করা যাবে না মানে, ধারণাকে যাচাই করে নিতে হবে, যাতে সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[৪২]
উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, যেভাবেই হোক না কেন ইসলামী আইনে কারো মানহানি করা বা মর্যাদাহানি ঘটানো কোনভাবেই সমীচীন নয়। ইসলামী আইনে যে কোন হারাম কাজের অপরাধের শাস্তি অনির্ধারিত তাযিরী দণ্ড। নিম্নে আমরা তাযিরী দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করবো।

تعزير : তাযির আরবী শব্দ। العزر ধাতুমূল থেকে উদ্ভুত। শাব্দিক অর্থ– রোধ করা, রোখা, ফিরিয়ে দেয়া, বাধা দেয়া, বারণ করা, নিবারণ করা ইত্যাদি। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় তাযির হলো, এমন দণ্ড বা শাস্তি ইসলামী শরীয়তে যার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নয়। এই দন্ড সাধারণত হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ লংঘনের অপরাধে কার্যকরি হয়ে থাকে। যে সব অপরাধ সুনির্দিষ্ট হদ্দ বা কাফফারার দণ্ডের পর্যায়ে পড়ে না।[৪৩]

তাযিরী দণ্ডের দর্শন

ইমাম যাইলাঈ বলেন, তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের দর্শন হলো, সতর্ক করা, অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা এবং তাকে ভয় দেখানো, যাতে অপরাধীর মধ্যে অপরাধ কর্ম পুনরাবৃত্তির সাহস না হয়। অবশ্য তাযিরের মূল উদ্দেশ্য অপরাধ থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত রেখে তাকে সংশোধন করে সমাজের সুস্থ ধারায় ফেরার সুযোগ করে দেয়া।[৪৪]

সতর্ক করার ব্যাখ্যায় ফকীহগণ বলেন, সতর্ক করার অর্থ হলো– অপরাধীকে পবিত্র করা, সুস্থ স্বাভাবিক করা, যাতে সে পুনরায় অপরাধে প্রবৃত্ত না হয় আর অন্যদের হুঁশিয়ার করা ; যাতে কেউ এমনটি করার ক্ষেত্রে সাবধান হয়। গণমানুষকে অপরাধ মুক্ত তথা পবিত্র রাখার এই একটিই মাত্র পথ, যাতে সমাজে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বিশৃংখলা দেখা না দেয়। এই সতর্ক সাবধান করার অর্থ মানুষের ধ্বংস বা ক্ষতি করা নয়। কিংবা কষ্ট নির্যাতন-নিপীড়ন কিংবা জুলুম অত্যাচার নয়। তাযির কখনো এমন হবে না, যা ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয় এবং সমাজে এর প্রয়োগের কারণে অসন্তোষ কিংবা অস্থিরতা দেখা দেয়।[৪৫]

তাযিরী বিধানের বৈশিষ্ট্য

শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব কাজ নিষিদ্ধ এমন কাজ করলে এবং যেসব কাজ করা বা পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয বা ওয়াজিব তা যথাযথ ভাবে না করলে যে কোন ব্যক্তি তাযিরী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

সর্বোচ্চ তাযিরী শাস্তি মৃত্যুদন্ড এবং সর্বনিম্ন তিরস্কার। অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের মাত্রা, তথা স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে বিচারক সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ যে কোন দণ্ড প্রয়োগ করতে পারেন ।

তাযিরী শাস্তির মধ্যে অর্থদণ্ড, জেল, জরিমানা, মালক্রোক, শ্রমদণ্ড ইত্যাদির যে কোন একটি অথবা একাধিক দণ্ড একসাথে কার্যকর হতে পারে।

তাযিরী শাস্তির বৈশিষ্ট্য হলো, অপরাধীর মান ও মর্যাদার তারতম্যের কারণে এতে শাস্তির মধ্যে কোন তারতম্য ঘটে না। তাযিরী অপরাধ যদি হক্কুল্লাহ লংঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয় তাহলে বিচারক যদি মনে করেন শাস্তি প্রয়োগ ছাড়াও অপরাধীকে সংশোধন করা সম্ভব তাহলে উপকারী বিবেচনায় বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু তাযিরী অপরাধ যদি হক্কুল ইবাদ সংক্রান্ত হয়, আর বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বিচার দাবি করে তাহলে বিচারকের পক্ষে অপরাধীকে ক্ষমা করা, শাস্তি রহিত করা কিংবা বিচার স্থগিত করার অধিকার থাকে না।[৪৬]

দুই ক্ষেত্রে তাযিরী দণ্ড প্রয়োগ হয়: ১. হক্কুল্লাহ লংঘনের ক্ষেত্রে এবং ২. হক্কুল ইবাদ লংঘনের ক্ষেত্রে।

১. যে বিষয়টি ব্যাপক গণমানুষের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটিই হক্কুল্লাহ হিসাবে বিবেচিত। যা রোধ করলে গণমানুষের ক্ষতি রোধ করা যায় তাই হক্কুল্লাহ; যা ব্যক্তি বিশেষের লাভ ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেই ধরনের ক্ষতি থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করা এবং বিরত রাখা মানেই হলো গণমানুষের উপকার সাধন করা, এরই নাম হক্কুল্লাহ।

২. হক্কুল ইবাদ হলো এমন জিনিস যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ও ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এমন অবস্থাও আছে যেখানে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয়টিই বিদ্যমান কিন্তু হক্কুল্লাহর প্রাধান্য রয়েছে, যেমন পরস্ত্রীকে চুমু দেয়া, জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি।

   কোন কোন ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয় উপাদান রয়েছে, তবে হক্কুল ইবাদ এর প্রাধান্য বিদ্যমান। যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে গালি দেয়া, কুৎসা রটানো ইত্যাদি।[৪৭]

তাযির একটি অর্পিত দণ্ড

'অর্পিত' শব্দের ব্যাখ্যা হলো, তাযিরী দন্ড বা শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়ত সম্পূর্ণই মুসলিম বিচারক ও শাসকের বিবেচনার উপর ন্যস্ত করেছে। শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী ও হানাফী মাযহাবপন্থী ফকীহগণের এটিই প্রসিদ্ধ মত। হুদ্দ বা কিসাসের শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কারো কমবেশী করার অবকাশ নেই। কিন্তু তাযিরী শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শাসক বা বিচারককে অপরাধী ও অপরাধের পর্যায় বিবেচনা করার জন্যে অনেকগুলো বিষয় পর্যালোচনা করার বিধান রাখা হয়েছে। অপরাধের অবস্থা বলতে বিচারককে অপরাধের কারণ দেখতে হবে। অপরাধটি যদি হুদ্দ পর্যায়ের অপরাধ হয় কিন্তু হুদ্দ প্রয়োগের শর্তাদি না থাকার কারণে এক্ষেত্রে হুদ্দ এর দণ্ড কার্যকর করা না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কঠোর তাযিরী দণ্ড দিতে হবে।

ইমাম যাইলাঈ র. বলেন, দণ্ড নির্ধারণের সময় বিচারককে অবশ্যই অপরাধীর অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ তাযিরের উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা। এই নিবৃত্তি নানাজনের নানাভাবে হয়ে থাকে। এমন অনেক মানুষ আছে, শুধু মৌখিক ভয় দেখালেই সে তাযিরী অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। আবার অনেকেই আছে যাদের কঠোর শাস্তি ছাড়া নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। অতএব শাস্তি নির্ভর করবে অপরাধীর মানসিকতা, অবস্থা ও অপরাধের মাত্রার উপর। অপরাধীর অবস্থা বুঝে বিচারক তা নির্ধারণ করবেন। 'অর্পিত' বলতে তাই বোঝানো হয়েছে।[৪৮]

মালেকী ফকীহগণ বলেন, গুণাগুণ, বিষয়, অপরাধের ধরণ, ক্ষেত্র ও পাত্র ইত্যাদি বিচারে তাযিরের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে অপরাধীর সত্তা, সাক্ষীর অবস্থা, অপরাধী ও বাদীর বর্ণনা ইত্যাদি বিচারককে পর্যালোচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে।

ইমাম কাররাফী র. বলেন, তাযিরী অপরাধের শাস্তি নির্ধারণে স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ এক জায়গায় একটি কথা কাজ বা আচরণ নিন্দনীয় আবার অন্য জায়গায় বা দেশে তা নিন্দনীয় নাও হতে পারে।

স্থানীয় সমাজে যা অপরাধ বা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত না হয় এবং তাতে যদি কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক চেতনাপরিপন্থি উপাদান না থাকে তবে তাতে তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।[৪৯]

যেসব কারণে তাযিরী শাস্তি রহিত বা বাতিল হয়

তিন কারণে তাযিরী শাস্তি রহিত হয়ে যায়, ১. অপরাধীর মৃত্যু ২. বাদী কর্তৃক অপরাধীকে ক্ষমা ঘোষণা ৩. অপরাধীর তওবা।

১. তাযিরী শাস্তি রহিতকরণে অপরাধীর মৃত্যু

যদি অপরাধীকে দৈহিক শাস্তি দেয়া হয়, অথবা যা তার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রহার, দেশান্তর, গৃহবন্দি, নজরবন্দি ইত্যাদি যা তার অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুজনিত কারণে তা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু আর্থিক শাস্তি যেমন জরিমানা, ভর্তুকি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপরাধীর জীবদ্দশায় দণ্ড ঘোষিত হলে মৃত্যু হলেও তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তা কার্যকর হবে। তখন এই দণ্ড তার জীবদ্দশার ঋণের সাথে তুলনা করা হবে, যা মৃত্যুর পরও পরিশোধযোগ্য।[৫০]

২. তাযিরী শাস্তি রহিতকরণে ক্ষমা

হক্কুল্লাহ সংশ্লিষ্ট অপরাধের তাযিরী শাস্তি বিচারকের ক্ষমা করার মাধ্যমে রহিত করা জায়েয। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি (হক্কুল্লাহ লংঘনের) কোন লঘু অপরাধ করে তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু হদ্দ ও কিসাস যোগ্য অপরাধ হলে ক্ষমা করা যাবে না"।[৫১]

কোন কোন ফকীহ বলেন, হক্কুল্লাহ সংশ্লিষ্ট তাযিরী দণ্ড হলেও তা ক্ষমা করা জায়েয নয়। যেমন নামায ত্যাগে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা যায় না। অনুরূপ কোন সাহাবীকে যদি কেউ হেয় করে, শাসকের কর্তব্য এই অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া। অদ্রূপ যেসব তাযিরী দণ্ড হদ্দ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু শর্ত পূরণ না করার কারণে তাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, সে ক্ষেত্রে অবশ্য তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু অপরাধ যদি হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার দাবি করলে বিচারকের ক্ষমা করার অধিকার থাকবে না। যে ক্ষমার মধ্যে গণস্বার্থ জড়িত সেক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমা বৈধ। অপরাধ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে সংশ্লিষ্ট হলে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বিচার দাবি করলে বিচার নিশ্চিত করা শাসকের কর্তব্য। এক্ষেত্রে মোটকথা হলো, শাস্তি প্রয়োগে জনস্বার্থ সংরক্ষিত হলে বিচারক শাস্তি প্রয়োগ করবেন।[৫২]

তাযিরী শাস্তি রহিতকরণে তওবা

অপরাধীর তওবার কারণে তাযিরী শাস্তি রহিত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের কিছু সংখ্যক ফকীহর মত হলো, তওবা করলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না। কারণ শাস্তি হলো অপরাধের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত। তবে তারা বলেন, তওবার কার্যকারিতা শুধু হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা রসূলুল্লাহ স. তওবার পর আর শাস্তি প্রয়োগ করেন নি। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "গোনাহ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি নিরপরাধির মতো।"[৫৩] কুরআনে কারীমে সূরা আনফালের ৩৮ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তওবাকে গোনাহ নির্মূলকারী বলেছেন।[৫৪]

প্রচলিত মানহানি আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যকার পার্থক্য

মানহানি তথা কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার শাস্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য আইন ইসলামী আইনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন খ্যাতিমান মুসলিম পন্ডিত আব্দুল কাদের আওদা র.। তিনি বলেন, ইউরোপীয় আইন যা রোমান আইনের উৎস থেকে উৎসারিত-তাই কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিমার্জিত রূপে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রেও চালু হয়েছে। বস্তুত মিথ্যাবাদিতার ক্ষেত্রে এই আইনগুলো স্ববিরোধী এবং গণপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনের ভিত্তিতে রচিত। এসব আইনে অনেক ক্ষেত্রেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় মুশকিল হয়ে পড়ে এবং মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য না করে উভয় পক্ষকেই শাস্তি দেয়া হয়। মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা থেকে নিবৃত্ত এবং সত্যবাদীকে সত্য বলার জন্যে উৎসাহিত করার উপাদান এসব আইনে নেই। ক্ষেত্র বিশেষ সত্যবাদী শাস্তি পায় এবং মিথ্যাবাদী পুরস্কৃত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার বিভেদ থাকে না, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে না আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে যায়। ফলে সমাজে গুণীর কদর কমে যায় এবং দুষ্টের প্রতি নিন্দাবোধ হ্রাস পায়।[৫৫]

প্রচলিত আইনে মিথ্যাবাদীর সুরক্ষা

প্রচলিত আইন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীকে সুরক্ষা দিয়েছে।

ক. কোন সরকারী চাকুরীজীবীর একান্ত রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রণেতারা যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দেয় আর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন কর্মকর্তা কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হয় কিংবা পদোন্নতি না পায়, পদাবনতি কিংবা শাস্তি পেতে হয়, পরবর্তীতে অভিযোগ বা রিপোর্ট প্রণেতার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়, সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা রিপোর্ট প্রণেতাকে শাস্তি পেতে হয় না, যা ইসলাম সম্মত নয়।

খ. অনুরূপ-নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও প্রচলিত আইন কোন কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারছে না। অনেকটা যেন মিথ্যাবাদিতাকেই সুরক্ষা দিয়েছে এ আইন।

গ. জাতীয় সংসদ চলাকালে সংসদ সদস্যগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে যতোই মিথ্যা ও কুৎসা বর্ণনা করুন না কেন প্রচলিত আইনে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য নয়। এই সুরক্ষা আইনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ সংসদ সদস্যগণ জাতির কল্যাণে সবধরনের ভয়ভীতি শংকামুক্ত অবস্থায় নির্দ্বিধায় যাতে কথা বলতে পারেন, সেইজন্য সংসদ চলাকালীন সময়ে তারা অবারিত বাক স্বাধীনতা ভোগ করবেন, তাদের কথাবার্তায় সব ধরনের বিধি-নিষেধ মুক্ত থাকা দরকার।

ঘ. অনুরূপ-বিচারকার্য চলাকালীন বিচারক ও আইনজীবীর মিথ্যাকথনকেও সুরক্ষা দিয়েছে আইন। আর এসবকে বলা হয়েছে বিশেষাধিকার। ইসলামী আইনে মিথ্যাবাদীর সুরক্ষা কিংবা মিথ্যাকথনের বিশেষাধিকারের অস্তিত্ব নেই। প্রচলিত আইন ব্যক্তি বিশেষকে মিথ্যা কথনের সুরক্ষা বা বিশেষাধিকার দিয়ে গোটা সাধারণ সমাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দিয়েছে। কারণ কোন সমাজের নীতি নির্ধারক শ্রেণীকে অনৈতিকতার অনুমতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে নৈতিকতায় বেধে রাখার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। এ বিশেষাধিকার থাকাবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান থাকে কিভাবে? ইসলামী আইনের মূলভিত্তিই হলো মিথ্যা ও বানোয়াট সর্বাবস্থায়ই অপরাধ এবং সত্য সর্বাবস্থায় কাম্য। ফলে যে যা, বা যার যা গুণ তা বলা এবং যার যা দোষ তা বলা ও লেখা ইসলামী আইনে অপরাধ নয় কিন্তু এর বিপরীত অপরাধ এবং অবশ্যই দণ্ডযোগ্য।[৫৬]

উপসংহার

ইসলামী আইন মিথ্যা, প্রতারণা, কুৎসা রটনাকে অপরাধ গণ্য করে সকল মানুষকে এসবের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে এবং মানুষকে এ জাতীয় অপরাধ থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। ইসলামী আইন সত্যবাদিতাকে প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য ঘোষণা করেছে আর মিথ্যাবাদের তিরস্কার ও ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে। ফলে ইসলামী আইন সত্যবাদীকে সত্যের অনুসারী হতে উৎসাহিত করে আর মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে উভয় শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ করেছে। যা প্রচলিত আইনের চেয়ে কল্যাণকর, সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ।

তথ্যনির্দেশ

১. 'সুনাম আইনের দৃষ্টিতে একটি সম্পত্তি। আমিন সাহেব একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা। তিনি কয়েক খণ্ড জমির মালিক। এটা হচ্ছে তার দৃশ্যমান সম্পত্তি। তার আরও কিছু সম্পদ আছে। সেটি হচ্ছে তিনি চোর নন, মাস্তান নন, দেউলিয়া নন, লম্পট নন, তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, লোকে তাকে ভাল মানুষ বলে জানে। লোকের এই ভালো জানাকেই বলে সুনাম এবং এই সুনাম আমিন সাহেবের অমূল্য সম্পদ। সম্পদ ও সম্পত্তি একই অর্থবোধক হলেও উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সম্পত্তি নশ্বর কিন্তু সম্পদ অবিনশ্বর, যদি না কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তা নষ্ট করতে চায়। সুতরাং, সুনামের উৎস অন্য ব্যক্তি। আবার অন্য ব্যক্তিই মানহানির মূল কারণ হতে পারে। এই অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের মুখের কথা, আচরণ বা লেখার দ্বারা যখন কারো মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে বিব্রতবোধ করে কিংবা অপমানিত বোধ করে অথবা লোক সামাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়, সুখ্যাতি বিঘ্নিত হয় এবং তা অন্যের গোচরে আসে তখন ঐ উক্তি বা লেখা, আচরণ বা প্রচারণা মানহানি বলে গণ্য হয়। বস্তুত ব্যক্তি সম্পর্কিত সুনাম নষ্টকারী নিন্দাবাদ প্রণয়ন এবং প্রকাশকে মানহানি বলে।' রহমান, গাজী শামসুর, *মানহানি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬,পৃ. ২৫

২. Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, mokes or publishes any imputation, concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person. –The Penal Code (Act XLV of 1860 Section 499).

৩. রহমান, গাজী শামসুর, *মানহানি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬,পৃ. ২৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ২১

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯-২০

৯. মালেক, ইমাম, *আল-মুয়াত্তা*, কায়রো : দারু ইবনুল হাইছাম ২০০৫, অধ্যায় : আকদিয়া, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিশ শাহাদাত : হাদীস নং-১৩৮২

১০. রহমান, গাজী শামসুর, *মানহানি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ।

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৮

১২/ক. *ডি.এল. আর* ১৫ (১৯৬৩), ঢাকা হাইকোর্ট পৃ. ৫০১

১৩. দণ্ডবিধি, ধারা নং ৫০০

১৪. রহমান, গাজী শামসুর, *মানহানি*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৫

১৪/ক. Sale of printed or engraved Substance containing defamatory matter : Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with sipmple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. The Penal Code (Act XLV of 1860) Section 502

১৫. ইবনে মাজা, ইমাম, *সুনান*, কায়রো : দারু ইবনুল হাইছাম, ২০০৫, অধ্যায় : মানাসিক, অনুচ্ছেদ : খুতবাতু য়াউমুন্নাহার, নং ৩০৫৫

১৬. আল কুরআন : ৪৯:১২; وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

১৭. আল কুরআন : ৪৯:১১; وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

১৮. আল কুরআন : ২৪:০৪; وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

১৯. আল কুরআন : ১৭:৩৬; وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

২০. আল কুরআন : ১০৪:০১; وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

২১. আল কুরআন : ৪৯:০৬; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

২২. আল কুরআন : ৪৯:১১; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

২৩. আল আমের, *ইসলামী দণ্ডবিধি*, মূল : ড. আবদুল আযীয আল আমের, (অনুবাদ : আবু শিফা), ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৫, সংখ্যা ২, পৃ. ৫২-৫৩

২৪. মানজুর, ইবনে, *লিসানুল আরব*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৩, খ.৭, পৃ. ৯৫
২৫. ওয়াযারাতুল আওকাফ, *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, আল-কুয়েত : -১৯৯৭, খ.৫, পৃ.২৭৬
২৬. ফারহুন, ইবনে, *তাবসারাতুল হুক্কাম*, হালবী, তা, বি, খ. ২, পৃ. ৩৭০
২৭. খাদিজা, আন্নাবরাভী, *মাওসূআতু হুকুকিল ইনসান ফিল ইসলাম*, মিসর : দারুস্-সালাম, ২০০৬, পৃ. ৪০৯
২৮. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ.-৫১
২৯. কুরতুবী, ইমাম, *তাফসীরে কুরতুবী*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ৮, পৃ. ৫৯১
৩০. আল কুরআন, ৪৯:১১; يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ -
৩১. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.২৪৮
৩২. আল কুরআন, ৯ : ৬৫, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ
৩৩. আল কুরআন, ৩৩ : ৫৭
৩৪. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০-২৫১
৩৫. মানজুর, ইবনে, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ ৬, পৃ. ৩১
৩৬. আল কুরআন ঃ ৪৯-১২
৩৭. ইবনে নুজাইম, *আল আশবা ওয়ান্নাজাইর*, মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ, সনবিহীন, পৃ. ৮১
৩৮. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা*, প্রাগুপ্ত, খ. ২৯, পৃ. ১৭৯
৩৯. রামলী, *নেহায়াতুল মুহতায*, হালবী, মাকতাবাতুল ইলমিয়া, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৪২৯
৪০. আল কুরআন, ৪৯ : ১২, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ
৪১. বুখারী, ইমাম, *http:/hadith.al-islam.com* অধ্যায় : আদাব, অনুচ্ছেদ : আয্‌যান্ন, হাদীস নং : ৫৬০৬
৪২. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ১৮১
৪৩. প্রাগুক্ত, খ.৩৩, পৃ. ২৫৬
৪৪. আল মাওয়ারদী, *আহকামুস সুলতানিয়া*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬,পৃ. ৪০
৪৫. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ২৫৬
৪৬. আল মাওয়ারদী, *আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৪৭. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ.২৬২
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. *মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৩৩, পৃ.২৮৪
৫১. হায়সামী, *মাজমাউল জাওয়ায়েদ*, মিসর :, কুদ্দুসী, তা.বি., খ. ৬, পৃ.২৮২
৫২. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ.২৮৬
৫৩. ইবনে মাজা, ইমাম, *সুনান*, দারু ইবনে হাইছাম, কায়রো : ২০০৫ খ. ৪, পৃ: ২৫৫, হাদীস নং ৪২৫০
৫৪. আল কুরআন, ৮:৩৮
৫৫. আওদা, আব্দুল কাদের, *আত্তাশরিউল জিনায়ী আল ইসলামী*, কায়রো : নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ-২০০৫, খ.২, পৃ. ৪০৫
৫৬. প্রাগুক্ত পৃ, ৪০৭

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলী

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় মেইল করে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে :

ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নাল-এ মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি;

গ) প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোন পান্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক জার্নাল-এর ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। তথ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র এভাবে লিখতে হবে।

যেমন- গ্রন্থ :

১. এবাদুল হক, কাজী, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

২. ইবনে হাযম, *আল মুহাল্লা*, আল-কাহেরা : মাকতাবা দারুত্তুরাস, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ৯০

৩. হুসাইন, যিকরা তাহা, *জামহুরিয়াতু মিসর আলআরাবিয়্যাহ*, ওযারাতুস সাকাফা, আলকাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

প্রবন্ধ ঃ

১. Monsoor, Dr. Taslima, Dissolution of Marriages on Test; A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic) হবে যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচারব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of islamic law and judiciary.*

৭. কুরআনুল করীম ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, অধ্যায়:--, অনুচ্ছেদ:---, খ.--, পৃ.। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text নিচে তথ্যপঞ্জিতে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ..

....

বয়স .... পেশা..

ফোন/মোবাইল ঃ .... সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➪ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-
➪ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-
➪ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July - September : 2010. Tk. 100

Design & Printing : An-Noor